দর্শনসোপান

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশ

৸৹

ধর্ম্মযোগ ঐ ১৲

গীতা সোপান ॥

ইংরেজীতে গীতার ভূমিকা ১

বেদান্ত সোপান ও অদ্বৈতবাদ ॥

দর্শন সোপান কাগজের বাঁধা ১।

ঐ কাপড়ের ঐ ১॥•

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১নং কর্ণওয়ালি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

M. Bhattacharyya & Co.
84, Clive Street, Calcutta.

গ্রন্থকার গৃহ

P. 205, Landsdown Extension
Ballygunge, Calcutta.

Lake view, Comilla.

দর্শনসোপান

তর্ক-বিজ্ঞান, ধর্মযোগ, বেদান্ত-সোপান, গীতা-সোপান ও
ইংরেজী ভাষায় গীতার ভূমিকা প্রণেতা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশ

উৎসর্গ

অনাদৃতা জননী বঙ্গভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
গৌরবময় স্বর্ণাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া

যিনি দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন,

সেই অমিততেজা পুরুষসিংহ

দেশমাতার ভক্তসন্তান

স্বর্গগত মহামনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এম-এ, ডি-এল, সরস্বতী, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী

মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থকারের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গ্রন্থকারের নিবেদন

বঙ্গভাষায় 'তর্কবিজ্ঞান' রচনা করিবার পর হইতেই আমার মনে মনে কল্পনা ছিল দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব ও জটিল তথ্যগুলি সরল ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া মাতৃভাষায় সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিব। কিন্তু অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত থাকায় এতদিন এ বিষয়ে মনোযোগী হইবার সুযোগ ঘটে নাই। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় ছিল বলিয়াও সহসা এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইতে সাহসী হই নাই। তদুপরি আমার বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্ন স্বাস্থ্যও আমার সংকল্প-সাধনার পথে অন্তরায় ছিল। কিন্তু যখন মনে হইল, মাতৃভাষার সেবা করিবার দুর্লভ অবসর ও সুযোগ জীবনের এই সায়াহ্নে হয়ত আর পাইব না, মনের ঐকান্তিক অভিলাষ হয়ত এ জীবনে অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে, তখন শারীরিক ও মানসিক সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া, সকল দ্বিধা ও কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া, যথাসাধ্য যত্নে ও পরিশ্রমে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া প্রকাশ করিলাম। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে অশীতিপর বৃদ্ধের হয়ত এই শেষ অর্ঘ্য—বঙ্গবাণীর পূজাবেদীমূলে দীন ভক্তের জীবন-সন্ধ্যায় শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমার সাহিত্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় এবং অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য নানা প্রকারেও এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমার রচিত তর্কবিজ্ঞান এবং ধর্ম-যোগের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত রাখিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। দর্শন-সোপানেও যে তাঁহার নাম সংযোজিত করিতে পারিয়াছি, ইহা আমার পরম গৌরব এবং সৌভাগ্যের বিষয়।

উপসংহারে সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি। প্রুফ দেখাইবার ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ নিজেও দেখিয়া দিতে পারি নাই। অনেকটি মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। যে কয়টি চোখে পড়িয়াছে শুদ্ধি-পত্রে সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

উপক্রমণিকা

বাংলাপাঠীদিগকে দর্শন-সোপান পড়িতে আমন্ত্রণ করিতেছি। দর্শন বিশ্ব-বিজ্ঞান। নিখিলবিশ্বের একটি সুসমঞ্জস চিত্র অঙ্কিত করা এবং তন্মধ্যেই মানবীয় আদর্শের লোভনীয় মূর্তি প্রদর্শন করা দর্শনের উদ্দেশ্য। 'দর্শন-সোপানে' এই চিত্র ও এই আদর্শ উভয়ই আছে।

বাংলাভাষায় যে সকল দর্শনের গ্রন্থ আছে, তাহা পাঠ করিলে ভারতীয় দর্শনের ও গ্রীক দর্শনের স্থূলজ্ঞান জন্মে, কিন্তু ইয়ুরোপীয় নব্যদর্শনে প্রবেশ হয় না, এবং বর্ত্তমান যুগে যে সকল সমস্যা মানব-সমাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে না। দর্শন-সোপান পাঠ করিলে নব্য ইয়ুরোপীয় চিন্তার সঙ্গে কতক পরিচয় ঘটিবে এবং উহাদের সহিত ভারতীয় চিন্তার কিরূপ মিল বা অমিল আছে, তাহাও অবিদিত থাকিবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে যাঁহারা দর্শনে বি. এ. পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদের সকলেরই ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে স্থূলভাবে পরিচিত হইতে হইবে। এটি বড় ভাল কাজ হইয়াছে; ইহার ফলে দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজে দার্শনিকচিন্তাপ্রবেশের দ্বার কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইবে। যাঁহারা বাংলা গ্রন্থ পড়িয়া ভারতীয় ও বিদেশীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের স্থূল জ্ঞান চাহিবেন, 'দর্শন-সোপান' তাঁহাদের উপকারে আসিবে। বি. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা এই বই পড়িয়া অনায়াসে 'জেনারেল ফিলসফির' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন।

বাংলাদেশ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ, সর্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে চাহেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বাংলাভাষার সাহায্যে হইবে। দেশ আশা

করে যে, শীঘ্রই ইন্‌টারমিডিয়েট এবং বি. এ. পরীক্ষাও বাংলা ভাষায় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই ন্যায্য আশা অচিরাৎ পূরণ করিতে পারুন বা না পারুন, এখনই বাংলা ভাষায় দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ-অঙ্গের গ্রন্থ লিখিত হওয়া ও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। দর্শনবিভাগের দুইখানি গ্রন্থ বাংলাদেশ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছেন, (১) তর্কবিজ্ঞান (উহা বহু বছর ইন্‌টার-মিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য ছিল), (২) দর্শন-সোপান। এখন এথিক্‌স্ ও সাইকলজির গ্রন্থ লিখিয়া কে ধন্য হইবেন? এথিক্‌স্ অর্থাৎ নীতি-বিজ্ঞান বিষয়ে ভারতের দৃষ্টি (point of view) লইয়া লিখিত গ্রন্থ ইংরেজিতেও নাই, অথচ উহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ঐরূপ গ্রন্থ না থাকার দরুণ শিক্ষিত ভারতবাসীরা আজ তাঁহাদের চির-পূজিত পুরাণ আদর্শকে (ideal) ছোট বলিয়া ভ্রম করিতেছেন এবং উহা জীবনে চরিতার্থ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারিতেছেন না।

বহু সংস্কৃত দর্শনগ্রন্থের এবং গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর দার্শনিক বিচার বা কথার (Dialogues) বাংলা অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান্, ইটালিয়ান্ ভাষায় নিবদ্ধ নব্য-যুগোপযোগী গ্রন্থের মর্ম ইংরেজি-অজানা বাঙ্গালী জানিতে পারেন না। ইহাদের বাংলাভাষায় অনুবাদ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কে এ কাজে অগ্রণী হইবেন? বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা এম্-এ পড়িবেন, তাঁহারা সপ্তাহে অগত্যা দুই ঘণ্টা শিক্ষকের উপদেশে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ কার্য করিবেন এবং উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। দুই বৎসরে প্রায় একশত ঘণ্টায় প্রত্যেক ছাত্রই বিস্তর অনুবাদ করিতে পারিবেন, এবং "অনুবাদ নিয়মিতভাবে ও যত্নের সহিত করা হইয়াছে" এই সার্টিফিকেট্ প্রফেসার দিলে, তবেই ছাত্রেরা এম-এ, পরীক্ষা দিতে

পারিবেন। এই সকল অনুবাদের মধ্যে বছর বছর দুই একখানি অনুবাদ অবশ্যই ভাল হইবে; উহা সংশোধন পূর্বক প্রকাশিত করিতে হইবে। যদি কোনও গ্রাজুয়েট কোন ভাল গ্রন্থের মূল দেখিয়া বাংলায় নির্ভুল এবং সুপাঠ্য অনুবাদ করিতে ও বাংলাভাষায় উহার সরল সংক্ষিপ্ত ভাষ্য লিখিতে পারেন, তবে তদ্দ্বারাই তাঁহার পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ হইতে পারিবে। বঙ্গের বর্তমান অবস্থায় নির্ভুল সুপাঠ্য 'অনুবাদ'কে মৌলিক গবেষণার সঙ্গে তুল্যমান দেওয়া সঙ্গত। 'দর্শন-সোপান' কোনও গ্রন্থের অনুবাদ নহে, তথাপি ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎ অনুবাদকারীদের উপকার হইবে।

দর্শন-সোপানের রচয়িতা শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় তাঁহার নিজের দার্শনিক মত সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া লিখেন নাই; দেশ-বিদেশের চিন্তা-ক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের সঙ্গে পাঠকের কথঞ্চিৎ পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। কুতূহলী পাঠকের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্য প্রকাশবাবুর 'দর্শন' বা 'মত' সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহার মতে দার্শনিক বা অন্য কোনও রূপ যুক্তি-তর্ক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানবীয় পুরুষকারের যাথার্থ্য এবং আত্মার অমরত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করিতে পারে না; অথচ এই সকল সিদ্ধান্তে বিশ্বাস তাঁহার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, ও তাঁহার কার্যে বরাবর উহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মানবের 'জানিবার ক্ষমতা' অর্থাৎ জ্ঞানার্জনশক্তি সীমাবদ্ধ; কিন্তু ঐ সীমাবদ্ধ জ্ঞানার্জন শক্তি বিশ্বের যে সংবাদ আনিয়া দেয়, তাহা দ্বারাই জীবনের কারবার নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়। নিঃসন্দিগ্ধ প্রমা জীবন-যাত্রা চালাইবার জন্য অপেক্ষিত নহে। 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা' দার্শনিক সত্য নহে; আর 'তর্ক' দ্বারা যে সংশয়ের দূর হয় না, তাহা তো অহরহই দেখা যায়। একথা

বাঙ্গালীর নিকট নূতন নহে, প্রাচীনেরা বলিয়াছেন 'তর্কে বহু দূর'। অপিচ, ঈশ্বরাদির সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তই করা হউক না কেন, উহার মধ্যে গোজামিল থাকিবেই। 'অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ' একথা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্য। বস্তুত ইহাই দর্শনের চরম শিক্ষা। যদি ইহাই ঠিক্ হয়, তবে 'মত' নিয়া মারামারি অন্যায়, নিজের 'মত' স্থাপন করিবার ও পর পক্ষের 'মত' নিরাস করিবার জন্য যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করা অর্থাৎ বিচার করা উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে 'আমার মত ভুলও হইতে পারে এবং বিপক্ষের মত সত্যও হইতে পারে'। বস্তুত একই বস্তু যেমন এক এক দিক্ হইতে এক এক রূপ দেখায়, তেমনি বিশ্বও এক এক দিক্ হইতে এক এক রূপ দেখাইতে পারে—প্রত্যেক দৃষ্টিই (দর্শনই) আংশিক সত্য। অংশ যখন অংশীকে মানে না, তখনই বিপদ ঘটে। একথা দর্শনে সত্য, কর্তব্য-বিজ্ঞানে সত্য, সমাজ-বিজ্ঞানে সত্য। কোনও অংশেরই অন্য অংশকে চাপিয়া রাখিয়া নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার নাই।

শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় ডেপুটি মাজিষ্টরীতে জীবন কাটাইয়া চাকরির শেষ ভাগে এডিশনেল ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন, তিনি পূর্বে 'তর্কবিজ্ঞান', 'ধর্মযোগ', 'গীতার ভূমিকা' ও 'বেদান্ত-সোপান' লিখিয়াছেন, এবং এখন 'দর্শনসোপান' লিখিলেন, অথচ আমরা যাঁহারা কলেজে দর্শন পড়াইয়া জীবন কাটাইয়াছি, তাহারা বাংলায় তেমন কিছু লিখিলাম না। এটা আপাতত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এমনটা সর্বদাই ঘটে। বিদেশীয় দার্শনিক এইরূপ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই অত্যুক্তির ভাষায় বলিয়াছেন "All the advances in philosophy are made outside of academic walls".

গ্রন্থকারের জীবন সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি। তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর, এই দীর্ঘ জীবনে বরাবর তিনি সোজা পথে সত্য ন্যায় ও পবিত্রতার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। সাধু কর্মের করণ ও অসাধু কর্মের অকরণ তাঁহার জীবনের ও দর্শনের মূল কথা, ভগবান্ তাঁহাকে ক্রমে ঊর্ধে নিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুত প্রকাশবাবু বয়স বিদ্যা অভিজ্ঞতা যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমার জ্যেষ্ঠ, তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখা আমার পক্ষে অশোভন; তথাপি কেন ইহা লিখিলাম, এই সম্বন্ধে এইটুকু আমার কৈফিয়ৎ যে, ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রের সস্নেহ অনুরোধ কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না এবং ইহার দ্বারা নিজেরও কিছু প্রচার করা হইবে, সন্দেহ নাই।

১লা মাঘ, ১৩৪৫।

শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী।

(বেদান্তরত্ন, বেদান্ততীর্থ এম, এ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তশাস্ত্রের ও গৌহাটী কটন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের ও শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের সংস্কৃতের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং কাশ্মীর শ্রীপ্রতাপ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)

সূচী।

প্রথম প্রকরণ

দর্শন কি ?

দ্বিতীয় প্রকরণ

তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় (Epistemology)।

তৃতীয় প্রকরণ

পারমার্থিক সত্তাবিজ্ঞান।

চতুর্থ প্রকরণ

দর্শন ও সৃষ্টি।

পঞ্চম প্রকরণ

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ।

জীবাত্মা।

ষষ্ঠ প্রকরণ

দর্শন এবং নীতি।

দর্শন এবং ধর্ম্ম।

প্রথম প্রকরণ

দর্শন কি ?

দর্শন শব্দের ধাতুগত অর্থ 'যাহা দ্বারা দেখা যায় অর্থাৎ যাহা দর্শন বা জ্ঞানের উপায়' ; 'ফিলসফি' (Philosophy) শব্দের ধাতুগত অর্থ 'জ্ঞানে প্রীতি'। ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, উভয় শব্দই এখন একটি শাস্ত্রের নাম ; এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সকল জ্ঞাতব্যের তত্ত্ব জানা যায়।

আমাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় দুই প্রকার,—ব্যাবহারিক (phenomenal) এবং পারমার্থিক (noumenal)। যাহাদিগের অস্তিত্ব জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞাতা থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি বাহিরের এবং অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি ভিতরের বিষয়, তাহারা ব্যাবহারিক সৎ বা সত্তা ; এবং যাহারা অন্য-নিরপেক্ষ (absolute) তাহারা পারমার্থিক সৎ বা সত্তা (noumenal or ultimate realities)।

দর্শন শাস্ত্রের যে শাখা ব্যাবহারিক-সদ্‌বিষয়ক মৌলিক নিয়মাদি শিক্ষা দেয় তাহার নাম প্রাকৃত বিজ্ঞান (natural philosophy) অথবা, এক কথায়, বিজ্ঞান (science)।

দর্শন শাস্ত্রের যে শাখা দ্বারা পারমার্থিক-সদ্‌-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম অতিপ্রাকৃত বিদ্যা বা অধ্যাত্ম-বিদ্যা (metaphysics) ও তত্ত্ব-বিদ্যা বা পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান (ontology)। দর্শন শাস্ত্রের যে শাখা দ্বারা 'জানা কি, জানিবার উপায় কি এবং আমাদিগের জানিবার সামর্থ্যই বা কতটুকু', এই সকল জানিতে পারা যায়, তাহার নাম প্রমাণ-বিজ্ঞান ও প্রমাবিদ্যা (logic and epistemology)।

দর্শন শব্দের ব্যাপক অর্থে, প্রাকৃত বিজ্ঞান, তত্ত্ব-বিজ্ঞান, এবং প্রমা-বিজ্ঞান, ইহারা সকলই দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত এবং প্রত্যেকটিই দর্শনের একটি শাখা। দর্শন শব্দের সঙ্কীর্ণতর অর্থে তত্ত্ব-বিজ্ঞানই দর্শন। কোনও কোন দার্শনিকের মতে, দর্শন প্রমা-বিদ্যার নামান্তর মাত্র।

কতিপয় প্রসিদ্ধ দার্শনিককৃত দর্শনের লক্ষণ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা হইতে, উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রাচীন যুগের সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে যাহা শাশ্বত, যাহা সকল জগদ্‌ব্যাপারের সার তত্ত্ব (essence), তাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই দর্শন। তাঁহার শিষ্য মহাদার্শনিক আরিষ্টটল প্রদত্ত একটি লক্ষণ অনুসারে, যে শাস্ত্র দ্বারা পারমার্থিক সত্তা এবং তাহার স্বরূপ জানিতে পারা যায়, তাহাই দর্শন। তাঁহার প্রদত্ত আর একটি লক্ষণ অনুসারে,— দর্শন মৌলিক-তত্ত্ব-বিজ্ঞান (science of first principles)। এই দুই দার্শনিকের মতেই দর্শন

(philosophy) এবং তত্ত্ববিদ্যা বা পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান (ontology) অভিন্নার্থক শব্দ।

দার্শনিক ক্যাণ্টের মতে, সংবিতের বিজ্ঞান ও সমালোচনাই (science and criticism of cognition) দর্শন। ফিস্‌টের মতে, দর্শন এবং প্রমাবিজ্ঞান (science of knowledge) একার্থবোধক। এই দুই দার্শনিকের মতেই প্রমাবিজ্ঞানই (epistemology) দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

শেলিংএর মতে, জগৎ কিরূপ হইলে আমাদিগের আত্মা ইহাকে জানিতে পারে এবং আত্মাই বা কিরূপ হইলে, ইহা জগৎকে জানিতে পারে, তাহা নিরূপণ করাই দর্শনের প্রধান কার্য্য। ইহার সোজা অর্থ এই যে, আত্মা এবং জগতের স্বরূপ ও তাহাদিগের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা নিরূপণ করাই দর্শনের লক্ষ্য।

হেগেলের মতে, দর্শন এবং সর্বনিরপেক্ষ-সত্তা-বিজ্ঞান (science of the absolute idea) একার্থবোধক।

দার্শনিক উল্‌ফ বলেন যে, যে সকল জাগতিক ব্যাপার আছে বা ঘটে, তাহারা কেন আছে বা ঘটে, তাহার নির্ণয় করাই দর্শনের লক্ষ্য অর্থাৎ আদি কারণ (ultimate reality) কি এবং ইহার সহিত জগদ্‌ব্যাপারের সম্বন্ধ কি, তাহার নিরূপণই দর্শনের লক্ষ্য।

দর্শনের ইতিহাস প্রণেতা বেবারের মতে, যে শাস্ত্র সর্বগ্রাহি জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তাহাই দর্শন। দর্শনের এই লক্ষণ অনুসারে

প্রমাবিজ্ঞান, পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান এবং প্রাকৃত বিজ্ঞান, ইহারা সকলই দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক কোঁতের মতে, দর্শন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নির্ণীত মৌলিক নিয়ম সকলের সমন্বয় (synthesis) দ্বারা, তাহাদিগের সাধারণ ভূমি কি তাহা নিরূপণ করাই দর্শনের লক্ষ্য।

স্পেন্সার দর্শনের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহাও কতকটা এইরূপ। তিনি বলেন যে, একত্ব-সূত্র-বর্জিত জ্ঞান অর্থাৎ অন্য বস্তু বা প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিতভাবে কতগুলি বস্তু বা প্রত্যয়ের জ্ঞান (un-unified knowledge) সব চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জ্ঞান। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই এক শ্রেণীর না এক শ্রেণীর জগদ্-ব্যাপারের সাধারণ ভূমির বা সাধারণ নিয়মের জ্ঞান; সুতরাং ইহা কতক পরিমাণে বহুর মধ্যে একত্ব গ্রাহী জ্ঞান (unified knowledge)। দার্শনিক জ্ঞান সকল প্রকার জ্ঞানের সাধারণ ভূমির জ্ঞান—জ্ঞানের ব্যাপকতম অবস্থা, সর্বজ্ঞানের সমন্বয় (knowledge of the highest degree of generality).

ইউরোপের মধ্যযুগীয় বহু দার্শনিককে শাস্ত্র-তান্ত্রিক দার্শনিক (schoolmen) বলে; তাঁহাদিগের দার্শনিক মতের নাম শাস্ত্রতান্ত্রিকতা (scholasticism)। তাঁহাদিগের মতে ঋষিদিগের (prophet) যে সকল বাণী আছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই দর্শনের লক্ষ্য। তাঁহাদিগের মতে আগে

বিশ্বাস পরে যুক্তি ; এই স্থলেই স্বাধীন-চিন্তামূলক এবং শাস্ত্রমূলক দর্শনের পার্থক্য। শাস্ত্রতান্ত্রিক দার্শনিকগণ কেহ বা প্লেটোর, এবং কেহ বা আরিষ্টটলের মতের সহিত ধর্ম মতের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; অবশ্য কৃতকার্য হইয়াছেন কিনা, তাহা অন্য কথা। ভারতীয় বৈদান্তিকগণও অনেকটা এই শ্রেণীর দার্শনিক। তাঁহাদিগের মতেও শ্রুতিবাক্য সকলকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা এবং তাহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখানই দর্শনের লক্ষ্য, এবং এইজন্যই বেদান্ত দর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম উত্তর-মীমাংসা। বেদের উত্তর-ভাগের অর্থাৎ উপনিষদুক্ত বাক্য সকলের সামঞ্জস্য ইহাতে দেখান হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম উত্তর মীমাংসা।

ভারতীয় কোনও দর্শনেই দর্শনের লক্ষণ দেওয়া হয় নাই। প্রাচীনকালে অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের ন্যায়, দার্শনিক গ্রন্থসকল সূত্র বা তন্ত্র নামে পরিচিত ছিল ; যেমন ব্রহ্মসূত্র, গোতমসূত্র, সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। পরবর্তী কালে, এই সকল গ্রন্থকে দর্শন আখ্যা দেওয়া হয়। হয়ত বা এই কারণেই দর্শনের লক্ষণ কোনও দর্শনেই স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় নাই। আধুনিকেরা 'তত্ত্ব-জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র দর্শন' এইরূপ বলেন। তত্ত্ব শব্দের অর্থ, বস্তুর প্রকৃত-রূপ (thing-in-itself)। তাহা হইলে দর্শন এবং তত্ত্ব-বিদ্যা বা পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান (ontology) একার্থবোধক। ভারতীয় সকল দর্শনেই অল্পবিস্তর তত্ত্বের এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়ের অর্থাৎ প্রমেয় এবং প্রমাণের

আলোচনা আছে—এই হিসাবে ইহারা একাধারে পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান এবং প্রমা-বিজ্ঞান (ontology and epistemology)। তাহা হইলেও কোনওটিতে তত্ত্ব-বিচারের এবং কোনওটিতে প্রমাণ-বিচারের উপর ঝোঁক বেশী। গোতমের ন্যায় দর্শনে, প্রমাণের আলোচনা বিস্তৃত, তত্ত্বের বা প্রমেয়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত ; কণাদের বৈশেষিকে ইহার বিপরীত। সাংখ্যে তত্ত্বের আলোচনা যত বিস্তৃত, তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়ের আলোচনা তত বিস্তৃত নহে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনাই পাতঞ্জলের বিশেষত্ব। ন্যায় এবং পাতঞ্জল এই দুইটি দর্শনকে প্রমাণ-বিজ্ঞান বলিলেও বিশেষ ভুল হইবে না। ন্যায় বৈশেষিক পরস্পর প্রপূরক এবং সাংখ্য পাতঞ্জলও পরস্পর প্রপূরক (complementary)।

কোনও কোনও দার্শনিক, অধ্যাত্মবিদ্যা (metaphysics) এবং তত্ত্ববিদ্যা (ontology) এই দুইটি কথা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ অধ্যাত্ম-বিদ্যা কথাটি দ্বারা, তত্ত্ববিদ্যা বা পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান এবং প্রমা-বিজ্ঞান একযোগে উভয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান কথার এই অর্থে, প্রত্যেক ভারতীয় দর্শনই অধ্যাত্ম বিদ্যা।

আরিষ্টটলের গ্রন্থসকল একত্র সন্নিবেশ করিবার সময় তাঁহার রচিত প্রাকৃত-বিজ্ঞান (physics) বিষয়ক গ্রন্থসকলের পরে অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থসকল সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। সেইজন্যই ইহাদিগের নাম হইয়াছিল মেটা-

ফিজিক্স্ (metaphysics)। সে যাহাই হউক, ব্যাবহারিক সত্তার পশ্চাতে, ইহার ভিত্তিস্বরূপ, পারমার্থিক সত্তা আছে ; ব্যাবহারিক সত্তার জ্ঞানের পরে পারমার্থিক সত্তার জ্ঞান হয় বলিয়াও মেটাফিজিক্স্ (metaphysics) নামের সার্থকতা আছে।

দর্শন শব্দের ব্যাপক অর্থে, পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান, প্রাকৃত-বিজ্ঞান এবং প্রমা-বিজ্ঞান, ইহারা দর্শনের এক একটি শাখা। তাহাদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ দাঁড়াইল, তাহা হইল অংশের সঙ্গে অংশীর সম্বন্ধ। দর্শন কথা দ্বারা কেবল পারমার্থিক-সত্তা-বিজ্ঞান বুঝাইলে, দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় তাহা হইল পারমার্থিক তত্ত্ব (noumena) এবং ব্যাবহারিক তত্ত্বের (phenomena) মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা। যেমন পারমার্থিক সত্তা বব্যাহারিক সত্তার ভিত্তি, তেমন দার্শনিক জ্ঞানও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি। দার্শনিক জ্ঞান দ্বারাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসকলের ঐক্য (unification) সাধিত হয়। ভারতীয় দার্শনিক দিগের ভাষায় অল্প কথায় এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, দার্শনিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয়। এই অর্থেই দর্শনকে বলা হয় বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (science of sciences); এই অর্থেই, ইহা আন্তর ও বাহ্য জগতের ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা। (Science is an interpretation of the world within and without, philosophy is an interpretation of that interpretation).

দর্শনের ইতিহাস-রচয়িতা বেবার বলেন, "দর্শন বাদ দিলে বিজ্ঞান হয় একত্ব-সূত্র-বর্জিত সমষ্টিমাত্র (an aggregate without unity)—আত্মশূন্য শরীর (a body without soul)। আবার দর্শনও বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বর্জিত হইলে, ইহা হইয়া দাঁড়ায় শরীরশূন্য আত্মা।"

দর্শনের সঙ্গে প্রমাণ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। 'দর্শন' উপেয় এবং 'প্রমাণ' উপায়। দার্শনিক জ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উভয়েরই উপায় প্রমাণ। এই প্রমাণের স্বরূপ, লক্ষণ ও ভেদ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে দর্শনের আলোচনা সুসাধ্য হয়।

দ্বিতীয় প্রকরণ

তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়

(Epistemology)

দুই উপায়ে সত্য নিরূপণ করিতে পারা যায় মুখ্য ও গৌণ ; যে উপায় দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা মুখ্য উপায় ; যে উপায় দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় তাহা গৌণ উপায়, যেমন অনুমান। পরোক্ষ জ্ঞান, প্রকৃত পক্ষে, অপরোক্ষজ্ঞান-মূলক। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায়ই এই প্রকরণের আলোচ্য বিষয়।

সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায় প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে ? ইন্দ্রিয়ব্যাপার জন্য যে সংবেদন (sensation), তাহাই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ শব্দটি সংবেদন-জন্য-জ্ঞান (sensual perception) ও বুঝায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শব্দটি, অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায় এবং অপরোক্ষ জ্ঞান, এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোতমের ন্যায়-সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে, ইহা দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ব্যাপার জন্য সংবেদনটুকুই মাত্র লক্ষিত হইয়াছে। কণাদ সূত্রে, সংবেদন এবং সংবেদন-জন্য জ্ঞান, এই উভয় অর্থেই প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যবহার আছে ; ইহাতে, প্রথমোক্তটিকে বলা হইয়াছে

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং শেষোক্তটিকে বলা হইয়াছে সবিকল্প প্রত্যক্ষ।

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থে, প্রত্যক্ষ শব্দ দ্বারা সকল প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মতে, গোতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। এইজন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষের লক্ষণে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত একটি লক্ষণ এই, "জ্ঞানাকরণক জ্ঞান প্রত্যক্ষ", অর্থাৎ অন্য-জ্ঞান যে জ্ঞানেব করণ নহে, তাহা প্রত্যক্ষ। এই লক্ষণ দ্বারা সকল প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা মনে থাকিলে, ভারতীয়-দর্শন পাঠকালে, প্রত্যক্ষ কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কোনও বিশেষ কষ্ট হইবে না।

কোনও কোনও দার্শনিকের মতে অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎকারি জ্ঞান লাভের এক দ্বিতীয় উপায়ও আছে; ইহা প্রতিভা বা ধ্যান। আমাদিগের সহজাত বা স্বভাবসিদ্ধ (innate) কতগুলি জ্ঞান আছে, যাহাদিগের সাহায্যে কেবল ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর না করিয়া (*a priori*), ধ্যান দ্বারাই পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করা যায়—কেবল যে করা যায় তাহা নহে, ইহাই পারমার্থিক তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায়। দার্শনিক হেগেল একস্থানে বলিয়াছেন, চিন্তাস্রোতকে বিনা বাধায় প্রবাহিত হইতে দেওয়াই পারমার্থিক তত্ত্ব জানিবার দার্শনিক উপায় (to leave thought to itself—to abandon it to its spontaneous activity is the true philosophical

method); চিন্তাস্রোতকে বিনা বাধায় প্রবাহিত হইতে দেওয়া আর ধ্যান একই কথা। এই ধ্যানের গাঢ়তম অবস্থাই সমাধি। কি উপায়ে চিন্তা স্রোতকে বিনা বাধায় প্রবাহিত হইতে দেওয়া যাইতে পারে, ভারতীয় যোগ-দর্শনে উহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উপায় শিক্ষা দেওয়াই পতঞ্জলির যোগ-দর্শনের বিশেষত্ব। নব্য প্লেটনিক মতের প্রতিষ্ঠাতা প্লোটিনাস্ বলেন, এই প্রণালীর ধ্যান দ্বারা, তাঁহার জীবনে তিনি চারবার পারমার্থিক তত্ত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানযুগের ভারতীয় দার্শনিকগণের শিরোমণি ডাক্তার সার্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ধ্যানের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রত্যক্ষবাদ এবং যুক্তিবাদ :
(Empiricism and Rationalism).

কোনও কোনও দার্শনিক মনে করেন যে প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতাই আমাদিগের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। আমাদিগের সকল অপরোক্ষ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ (*a posteriori*), যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষবাদী (empiricist) বলে: তাঁহাদিগের মতের নাম প্রত্যক্ষবাদ (empiricism)।

প্রত্যক্ষবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে আমাদিগের সংবেদন (sensation) যখন ব্যাবহারিক সত্তার সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, তখন ইহা দ্বারা পারমার্থিক সত্তা

কি, অথবা পারমার্থিক সত্তা বলিয়া কোনও স্থায়ী সত্তা আছে কিনা তাহাও আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে সংবেদনবিজ্ঞানবাদী (sensationalist) বলে; তাঁহাদিগের মতের নাম সংবেদনবিজ্ঞানবাদ (sensationalism)। এই মতে আমাদিগের জ্ঞান ব্যবহারিক সত্তার গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইতে পারে না বলিয়া ইহার অপর নাম ব্যাবহারিকসত্তাবাদ (phenomenalism)।

যে সকল দার্শনিক মনে করেন যে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষভাবে (*apriori*, কেবল প্রতিভা বা ধ্যান দ্বারাই পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাঁহাদিগকে প্রাতিভবাদী বা যুক্তিবাদী (rationalist) বলে; তাঁহাদিগের মতের নাম প্রাতিভবাদ বা যুক্তিবাদ (rationalism)।

প্রাতিভবাদী বা যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ সহজাত বা স্বভাবজাত জ্ঞানে বিশ্বাসী। কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের আত্মার স্বভাবই এইরূপ, যে কতগুলি বিষয় স্বভাবতই (intuitionally) ইহার নিকট প্রতিভাত হয়। জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের জ্ঞান এই শ্রেণীর জ্ঞান। এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বিনা বিচারেই (instinctively) এই সকলের সত্যতায় বিশ্বাস জন্মে; ঈশ্বরের অস্তিত্বে, নিজের অস্তিত্বে এবং জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস এই শ্রেণীর জ্ঞান। আবার কেহ কেহ বলেন কতগুলি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত অনুভূতি লইয়া আমরা জন্মি; এই সকল

আমাদিগের সহজাত (innate) জ্ঞান। দ্রব্য, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, দেশ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান, এই শ্রেণীর জ্ঞান।

আর এক ভাবেও প্রাতিভবাদী বা যুক্তিবাদী দার্শনিকদিগের বিভাগ করা যায়। কোনও কোন যুক্তিবাদী দার্শনিকের মত এই যে, পারমার্থিক তত্ত্ব ঈশ্বর চিন্ময় এবং আমাদিগের আত্মাও চিন্ময়; সুতরাং আত্মা আত্মস্থ হইলেই ঈশ্বর-ভাবাপন্ন হয় এবং ঈশ্বরকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে। এই প্রকার যুক্তিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক যুক্তিবাদ (metaphysical rationalism)। ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা, জ্ঞানমার্গকেই পারমার্থিক তত্ত্ব জানিবার একমাত্র উপায় মনে করেন, তাঁহাদিগেরও এই কথা। সকল প্রকার অনাত্ম বস্তুকে চিন্তাপথ হইতে অপসৃত করিয়া আত্মস্থ হওয়া জ্ঞানমার্গের উপদেশ। আত্মস্থ হওয়া আর পারমার্থিক তত্ত্ব-ভাবে ভাবান্বিত হওয়া একই কথা।

দ্বিতীয় এক প্রকার যুক্তিবাদ আছে ইহার নাম জ্যামিতিক (mathematical) যুক্তিবাদ। দার্শনিক ডেকার্ট অভিজ্ঞতার পরীক্ষা দ্বারা তিনটি আধ্যাত্মিক স্বতঃসিদ্ধ নিরূপণ করেন, এবং এই সকলকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই তিনটির প্রথমটি, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি" = "Cogito, ergo sum"। দ্বিতীয়টি, আমি সসীম, অথচ আমার মধ্যে অসীমের জ্ঞান আছে, সুতরাং এক অসীম, অনন্ত সর্বশক্তিমান্ সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরও আছেন। তৃতীয়টি,

আমি বাধা পাই সুতরাং আমাকে বাধা দেয় এমন এক সত্তাও আছে—ইহাই জগৎ। যে ভাবে তিনি স্বতঃসিদ্ধ কয়টিকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইবে, তিনি যেন এই সকলকে যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা হইলে এই সকলের স্বতঃসিদ্ধত্বের হানি হয়, ইহারা যুক্তিমূলক দার্শনিক মত হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত কথা কথা এই যে, যদিও ডেকার্ট এই তিনটি সিদ্ধান্তের আবিষ্কারের জন্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তথাপি এই তিনটি সত্য, তাঁহার মতে মানস প্রত্যক্ষের ফল, কোন যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহাদিগকে প্রমাণ করা যায় না।

তৃতীয় এক প্রকার যুক্তিবাদ আছে, যাহার নাম আকৃতিপ্রদ (Formalistic) যুক্তিবাদ। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট ইহার প্রবর্তক। তাঁহার মতে দ্রব্য (Substance), কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Causality), দেশ (Space), এবং কাল (Time), এই সকলের জ্ঞান সহজাত (Innate)। ইহাদিগের সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষমূলক প্রত্যয় বা ভাব (Idea) সকলকে আকার দেই বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করি এবং তাহাদিগের সম্বন্ধ নিরূপণ করি। ইহাদিগের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানে অর্থাৎ ব্যাবহারিক বিষয়ে আবদ্ধ; সুতরাং ইহাদিগের সাহায্যে আমরা পারমার্থিক তত্ত্বের (noumenon এর) জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আমাদিগের প্রজ্ঞান বা যুক্তি প্রত্যক্ষলব্ধ প্রত্যয়ের মধ্যে আবদ্ধ; সুতরাং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান দ্বারাও (pure reason) পারমার্থিক তত্ত্বে

পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। পারমার্থিক সত্তার প্রত্যক্ষানুভূতি হয় না; বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান দ্বারাও ইহার অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। ইহাই তাহার রচিত 'বিশুদ্ধ-প্রজ্ঞানের সমালোচনা বা মীমাংসা' (Critique of Pure Reason) গ্রন্থের সার কথা। ইহা দ্বারা আপাতত মনে হইতে পারে যে ক্যান্ট সংশয়বাদী ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ তাঁহার 'কর্মকরি প্রজ্ঞান সমালোচনা' (Critique of Practical Reason) গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, যেমন অনুভূতি এবং চিন্তা আমাদিগের আত্মার দুইটি বৃত্তি, তেমন ইহার একটি নৈতিক বৃত্তিও আছে। অনুভূতি বা চিন্তা দ্বারা আমরা পারমার্থিক তত্ত্বে পৌঁছিতে না পারিলেও আমাদিগের নৈতিক বৃত্তি বা বিবেক (moral faculty), স্পষ্টভাবে আমাদিগকে ইহার সংবাদ দেয়। ইহা আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে এবং আমরাও অর্থাৎ জীবও আছি। কেবল তাহা নহে, এই নৈতিক বৃত্তি দ্বারা ইহাও জানিতে পারি যে, আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of will) আছে; সুতরাং নৈতিক দায়িত্বও আছে।

লক, হিউম, মিল, বেইন প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ্যবাদী (empiricist)। লক বলেন যে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ ভাবে আমরা কোনও জ্ঞান লাভ করিতে পারি না; ইন্দ্রিয়ই আমাদিগের সকল জ্ঞানের উপাদান যোগায়। আমাদিগের মন একখানা সাদা কাগজের মত। যাহা ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহির

হইতে আসে মাত্র তাহারই ছাপ ইহাতে পড়ে, এবং এই সকল ছাপই আমাদিগের সকল প্রকার জ্ঞানের মূল। আমাদিগের সহজাত (innate) কোনও জ্ঞান নাই। স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতির জ্ঞানও—যাহাদিগকে অনেকে সহজাত জ্ঞান বলেন তাহারাও—মূলতঃ ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান। যদি এই সকল জ্ঞান সহজাত হইত তবে বালক বৃদ্ধ যুবা, সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই এই সকল জ্ঞান থাকিত। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে একটি শিশু কিংবা একজন অসভ্যের এই সকল জ্ঞান আছে? স্বতঃসিদ্ধের জ্ঞান ত দূরের কথা কোনও সামান্যের জ্ঞানও তাহাদিগের নাই। তাহারা বিশেষ বিশেষ স্থূল দেখিয়া বিশেষের জ্ঞানই লাভ করে। আর এক কথা এই, সহজাত জ্ঞান বলিয়া কিছু থাকিলে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়-ব্যাপার জন্য কোনও জ্ঞান প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই এই সকলের প্রকাশ হওয়া উচিত। কিন্তু এমন ত দেখা যায় না। তবে সহজাত জ্ঞান বলিয়া কোন জ্ঞান আছে ইহা স্বীকার করা যায় কেমন করিয়া?

লকের এই মতের বিরুদ্ধে বলা হয় যে তিনি যে রূপ স্থূল অর্থে সহজাত জ্ঞান শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন, ডেকার্ট প্রভৃতি দার্শনিকগণ কথাটি ঠিক সেইরূপ স্থূল অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা সহজাত জ্ঞান বলিতে পূর্ণ বিকসিত জ্ঞান লক্ষ্য করেন নাই; তাঁহারা বলেন যে, এই সকল সহজাত জ্ঞানের বীজ মানব-মনে জন্ম হইতেই থাকে, উহারা বাহির হইতে ইন্দ্রিয়পথে আসে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল

বিকশিত হয় এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতির জ্ঞান বীজ রূপে তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে, পরে বয়সের এবং মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়।

লক একস্থলে বলিয়াছেন যে, যাহা ইন্দ্রিয়েতে নাই তাহা বুদ্ধিতেও নাই (what is not in the sense is not in the intellect)। যুক্তিবাদী লাইব্‌নিট্‌ ইহার উত্তরে বলেন, বুদ্ধির মধ্যে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, বুদ্ধি যে আছে, ইহাতে কোনোও সংশয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, আমাদিগের বুদ্ধি একটা নিষ্ক্রিয় বৃত্তি নহে। ইহা বাহির হইতে আগত প্রত্যয়সকলকে সাজাইয়া গুছাইয়া প্রকৃত জ্ঞানে উন্নীত করে এই কথা সত্য ; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষভাবেও কোনো কোনো জ্ঞানের বীজ থাকাও অসম্ভব নহে।

এই সকল হইতে আমাদের মনে করা উচিত হইবে না যে, লক সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদিগের সকল জ্ঞানই সংবেদন (sensation) মূলক হইলেও আমরা ইহাদিগের সাহায্যেই জানিতে পারি যে, আমাদিগের মনের বাহিরে এক প্রকৃত জগৎ আছে, আমাদিগের আত্মাও আছে এবং ঈশ্বরও আছেন।

তাঁহার মতে আমাদিগের মনের বাহিরের বাস্তব জগতের দুই প্রকার গুণ আছে—মুখ্য এবং অমুখ্য। বিস্তার এবং অভেদ্যতা (extension and impenetrability)

মুখ্য গুণ ; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি অমুখ্য গুণ। মুখ্য গুণ সকল বস্তুগত, এবং অমুখ্য গুণ সকল বিষয়িগত। মুখ্যগুণ বিশিষ্ট জগতের অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরে। অমুখ্যগুণ বিশিষ্ট জগতের অস্তিত্ব আমাদিগের মনের ভিতরে ; জ্ঞাতা থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না। মুখ্যগুণ সকলের অনুভূতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদিগের মনের বাহিরে এক বাস্তব জগৎ আছে এবং অন্তর্দৃষ্টি (introspection) দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, আমাদিগের অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছার পশ্চাতে এক স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল সত্তা বা আত্মা আছে। জগৎ এবং আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞান হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আছেন।

লকের পরবর্তী হিউম প্রমুখ কোনও কোন দার্শনিক মনে করেন যে, লক যে সকল গুণকে মুখ্যগুণ বলিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সকল গুণও অমুখ্য। এই সকলের অনুভূতি ও প্রত্যক্ষমূলক সুতরাং সংবেদন (sensation) সাপেক্ষ। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, আমাদিগের সকল প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানই সংবেদনমূলক। আমরা যে জগৎ দেখি ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে। ইহার পশ্চাতে কোনও পারমার্থিক জগৎ আছে কি নাই, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে না। এইরূপ জগতের অস্তিত্ব সন্দেহের গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এই সকল দার্শনিক ছিলেন সংশয়বাদী (sceptic)।

বিকাশবাদী স্পেন্সার বলেন যে, আমরা যে সকল জ্ঞানকে জন্মগত বা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহারা বর্তমানে আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া মনে হইলেও গোড়াতে ইহারা প্রত্যক্ষমূলকই ছিল। আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ প্রত্যক্ষের সাহায্যেই এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। বংশ পরম্পরায় (by the principle of heredity) এই সকল জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয় যেন এই সকল প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ স্বাভাবিক জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এই সকল বিকাশেরই ফল। প্রত্যক্ষবাদী হইলেও স্পেন্সার সন্দেহবাদী ছিলেন না। তিনি বলেন সন্দেহ দ্বারাই যে আমাদিগের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় ইহা সত্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল সন্দেহের জন্যই সন্দেহ করা উচিত নহে। আমাদিগের সংবেদনের বাহিরেও যে পরমার্থিক জগৎ আছে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু ইহা আছে, কেবল এই মাত্রই জানি। ইহার স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত। ইহা জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা কেবল অজ্ঞাত নহে, অজ্ঞেয়ও বটে (unknown and unknowable)।

জানা বলিতে কি বুঝা যায় ?

উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ এবং ধ্যান, এই দুই উপায়ে আমরা অপরোক্ষ ভাবে সত্য জানিতে পারি। এখন গোড়াতেই কথা উঠে, জানা বলিতে আমরা কি বুঝি ?

দার্শনিক ক্যাণ্ট বলেন, অন্য প্রত্যয় (idea) নিরপেক্ষভাবে কেবল একটি প্রত্যয়ের জ্ঞানকে জানা বলে না। প্রত্যেক জানার মধ্যে একটি প্রত্যয়ের উদ্দেশ্যে আর একটি প্রত্যয়ের বিধান থাকে—অন্বয়ী (affirmative) ভাবেই হউক বা ব্যতিরেকী (negative) ভাবেই হউক।

প্রত্যেক জানার মধ্যেই উদ্দেশ্য (subject) এবং বিধেয় (predicate), এই উভয়ই থাকে। সুতরাং জানা মাত্রই এক একটি অবগতি (judgment)। জানা মাত্রই অবগতি হইলেও, অবগতি মাত্রই জানা নহে। কোনও অবগতিকে জানা হইতে হইলে, ইহাতে কেবল আকারগত ভাবে (formally) উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকিলে চলিবে না। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে সত্যও হইতে হইবে। 'আকাশে উড্ডীয়মান অশ্ব।' ইহা একটি অবগতি। কিন্তু ইহাকে জানা আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা, ইহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে।

জানাও দুই প্রকার। সংশ্লেষণাত্মক (synthetical) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytical)। যে জানাতে, বিধেয়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করে না, ইহা বিশ্লেষণাত্মক। 'শরীর বিস্তার বিশিষ্ট।' ইহা একটি বিশ্লেষণাত্মক অবগতি, কেননা, শরীর কথা দ্বারাই, ইহা যে বিস্তার বিশিষ্ট, তাহা বুঝা যায়। ইহাতে, বিধেয়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করে না। কিন্তু, 'অগ্নি ধাতুর আয়তন বাড়ায়।' এই অবগতিতে উত্তাপ যে ধাতুর আয়তন বাড়ায়, এই একটি নূতন তত্ত্ব আছে। কেবল ধাতু শব্দের অর্থ

হইতে ইহা জানা যায় না। ইহা একটি সংশ্লেষনাত্মক অবগতি। আবার কোনও অবগতিকে বৈজ্ঞানিক জানা হইতে হইলে, ইহাকে সর্বকালে এবং সর্ব অবস্থাও সত্য হইতে হইবে। আজ এখানে গরম পড়িয়াছে, ইহা একটি সংশ্লেষণাত্মক অবগতি। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক জানা নহে। কারণ, আজ এখানে গরম পড়িয়াছে, কাল এখানে গরম নাও পড়িতে পারে 'উত্তাপ ধাতুর আয়তন বৃদ্ধি করে।' ইহা একটি বৈজ্ঞানিক জানা বা জ্ঞান। কারণ ইহা সকল সময়ই সত্য।

প্রত্যেক জানার মধ্যেই একটি বিধেয় থাকে। যত প্রকারের প্রত্যয় বিধেয় হইবার সম্ভব, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণ, ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তির উপরে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। এই সকলকে বলা হয় বিধেয় (categories)। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই সকলকে বলেন পদার্থ। ইহাদিগের একটি না একটি পদমাত্রেরই অর্থ, এইজন্য ইহাদিগকে বলা হয় পদার্থ এবং প্রত্যেক জানার মধ্যেই, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাদিগের একটি না একটিকে বিধান করা হয় বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় বিধেয় (predicables)।

এই বিধেয় সকলের, যে ভাবেই শ্রেণী বিভাগ করা হউক না কেন, তাহাদিগের মধ্যে দ্রব্য (substance), দেশ (space), কাল (time) এবং কার্য-কারণ-সম্বন্ধ (causality), এই কয়টিই প্রধান এবং বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রত্যেক জানার মধ্যেই এক ভাবে না এক ভাবে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, এই সকলের বিধান থাকে।

আমি বলিলাম 'আমি এই বৃক্ষটিকে জানি।' একটু সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমার এই জ্ঞানের মধ্যে দেশের জ্ঞান, কালের জ্ঞান, কার্যকারণ সম্বন্ধের এবং দ্রব্যের জ্ঞানও অল্পবিস্তর রহিয়াছে। বৃক্ষটিকে যখন জানি, ইহাকে দেশ এবং কালগতভাবেই জানি। ইহাকে আমার সংবেদনের কারণ বলিয়াই জানি। কেবল তাহা নহে, যে শক্তি বা গুণের দ্বারা ইহা আমার সংবেদনের কারণ হইয়াছে, ইহা যে, সেই শক্তি বা গুণের আশ্রয় তাহা বলিয়াও জানি।

দ্রব্য, দেশ, কাল এবং কার্য্য-করণ-সম্বন্ধ।

দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি এমন এক সত্তা, যাহা গুণ এবং ক্রিয়ার আশ্রয় বা ভিত্তি। এই অর্থেই ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয় substance। ইহা, ইহার গুণ বা ক্রিয়া-শক্তি দ্বারাই আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইলেও ইহা নিজে নিত্য, অপরিবর্তনশীল এবং অন্য নিরপেক্ষ। ইহার ঘাত প্রতি-ঘাতের শক্তি আছে। ইহা দ্বারা আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল উত্তেজিত হইলেই আমরা ইহার গুণ—রূপ, রস প্রভৃতির প্রত্যক্ষ করি। অবশ্য গুণ সকলই আমাদিগের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। কিন্তু দ্রব্য স্বরূপত (in itself) কি তাহা আমরা জানিতে পারি না।

দার্শনিক ডেকার্ট বলেন, যাহা সর্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ; যাহার অস্তিত্বের জন্য, অন্য কোনও সত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না, তাহাই দ্রব্য। যদি তাহাই হয়, তবে, দ্রব্য একাধিক হইতে পারে না; কারণ, একাধিক হইলে তাহারা পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই অন্যসাপেক্ষ হইয়া পড়ে। ইহা দেশ কালেরও অতীত; সুতরাং, ইহা এক অনন্ত, অসীম এবং অদ্বিতীয় সত্তা। তাহা হইলে একমাত্র ঈশ্বর বা আদি কারণই দ্রব্য। কিন্তু তাহা হইলেও, ডেকার্ট, বিস্তার এবং জ্ঞান (extension and thought) বা জড় এবং চৈতন্যকেও দ্রব্য আখ্যা দিয়াছেন। তবে, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, চৈতন্য এবং জড় কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় সাপেক্ষ হইলেও অন্যের সঙ্গে তুলনায় ইহারা নিরপেক্ষ। তাঁহার পরবর্তী দার্শনিক স্পিনোজা তাঁহার মতের এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলেন যে, জ্ঞান ও বিস্তার (thought and extension), ইহারা দ্রব্য নহে; ইহারা দ্রব্যের গুণ। দ্রব্য এক সর্বনিরপেক্ষ পারমার্থিক তত্ত্ব (absolute ultimate reality)।

ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে যাহা গুণ এবং ক্রিয়ার আশ্রয় তাহাই দ্রব্য। তাঁহাদিগের মতে পরমাত্মা, জীবাত্মা, জড় পরমাণু, দেশ কাল, প্রভৃতি সকলই দ্রব্য।

দেশ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সত্তা যাহা আছে বলিয়া সসীম বস্তু সকল একে অন্যের বাহিরে থাকিতে পারে। ইহা, দীর্ঘে, প্রস্থে ও গভীরতায়, তিন দিকেই

অনন্ত। দেশ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, ইহার সীমা রেখা টানিলে দেশের মধ্যেই টানিতে হয়।

কাল এমন একটি সত্তা যাহা আছে বলিয়া আমরা ঘটনা সকলের পৌর্বাপর্যের (succession of events এর) জ্ঞান লাভ করিতে পারি। ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন, যাহা আমাদিগের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ জ্ঞান লাভের কারণ তাহাই কাল। ইহাও অনাদি এবং অনন্ত।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বলিতে কি বোঝায়, এই বিষয়ে দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঘটনা পরম্পরার মধ্যে একটা নিয়ত পৌর্বাপর্য সম্বন্ধের জ্ঞান মাত্র। যে ব্যাপারটিকে কার্য বলি, যাহা নিয়তই অর্থাৎ সর্বতোভাবে অন্য সম্বন্ধ নিরপেক্ষ ভাবেই (invariably and unconditionally), তাহার পূর্বে থাকে, তাহাকে তাহার কারণ বলি। এই ছাড়া কার্যকারণ সম্বন্ধজ্ঞানের মধ্যে আর কোনও অপরিহার্য সম্বন্ধ (necessary connection) নাই। ভারতীয় নৈয়ায়িক-দিগেরও কার্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান কতকটা এইরূপ। তাহারা বলেন "প্রাগভাবত্বং কার্যত্বম্"। যাহার পূর্ব্বে অভাব ছিল, তাহাই কার্য। মিল বলেন, যাহার আদি আছে তাহাই কার্য্য। প্রাগভাবত্বম্ এবং আদিমত্বম্, একই কথা। কারণ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন "কার্য্যনিয়তপূর্বভাবিত্বং কারণত্বম্"। নিয়তই যাহা কার্যের পূর্বে থাকে তাহাই কার্য্যের কারণ। সুতরাং নৈয়ায়িক দার্শনিকদিগের মতেও

কার্য কারণ সম্বন্ধ, নিয়ত-পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নহে।

অন্য এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁহারা বলেন কার্য-কারণ-সম্বন্ধ জ্ঞান যে কেবল পৌর্বাপর্যের জ্ঞান তাহা নহে; ইহা তাহা হইতেও কিছু বেশী। কারণ যে কেবল কার্যের পূর্বে থাকে তাহা নহে, কারণ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাই কার্য ঘটায়। ইহাই কার্য কারণের মধ্যে অপরিহার্য সম্বন্ধ (necessary connection)।

এখন প্রশ্ন হইল দ্রব্য, দেশ, কাল এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের (causalityর) জ্ঞান আমরা লাভ করি কিরূপে? ইহা কি প্রত্যক্ষমূলক *(a posteriori)* না প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ *(a priori)*?

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ (লক, হিউম্, মিল প্রভৃতি) বলেন যে এই সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষ মূলক। দার্শনিক লক বলেন যে, গুণের প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা মনে করি যে, ইহার আশ্রয়স্বরূপ এক স্থায়ী সত্তা আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের অন্য কোনও প্রমাণ নাই। ইহা আছে, কিন্তু ইহা কি, তাহা জানিবার কোনোও উপায় নাই—ইহা একটা "I know not what"। মিল বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা ইহা কি, জানিতে পারি না, ইহা প্রত্যক্ষের একটা স্থায়ী কারণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা মাত্র। (permanent possibility of sensation)। মোটের উপর প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদিগের মত এই যে, গুণ এবং

শক্তি বা ক্রিয়ার আশ্রয় স্বরূপ একটা স্থায়ী সত্তা থাকাই সম্ভব। ইহাই দ্রব্য, ইহার বিষয়, আমরা ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু জানিতে পারি না।

যুক্তিবাদী (rationalistic) দার্শনিকগণ বলেন, দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদিগের ইহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক ধারণা আছে। ইহা প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (*a priori*)। ইহার জ্ঞান আমরা ভিতর হইতেই লাভ করি। আমরা অনুভব করি, চিন্তা করি, ইচ্ছা করি। এই সকল মানসিক অবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারি যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থার পশ্চাতে এক স্থায়ী সত্তা আছে, যে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে। এই আত্মজ্ঞান (self consciousness) হইতেই, উপমানের (analogyর) সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি অবস্থার পশ্চাতেও এক অপরিবর্তনশীল নিত্য সত্তা রহিয়াছে এবং ইহাই দ্রব্য।

দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণের মত এই যে, ইহার জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ (*a posteriori*)। আমাদিগের হস্তপদাদির সঞ্চালন হইতে এবং জাগতিক বস্তুনিচয়ের গতি হইতেই আমরা দেশের জ্ঞানলাভ করি। যে স্থলে গতির বাধা হয়, আমরা মনে করি, সেই স্থল অন্য বস্তু দ্বারা পূর্ণ এবং যে স্থলে এরূপ বাধা পাওয়া যায় না সেই স্থল শূন্য (vacuum)। এই মতের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যুক্তি, চক্রক যুক্তি হইয়া পড়ে। কারণ

দেশের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা গতির জ্ঞান লাভ করি। পূর্বে দেশের জ্ঞান না থাকিলে গতির জ্ঞান লাভ হইতে পারিত না। অতএব দেশের জ্ঞানের জন্য প্রত্যক্ষ যথেষ্ট নহে।

স্পেন্‌সার প্রভৃতি বিকাশবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, গোড়াতে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতা দ্বারাই দেশের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বংশ পরম্পরায় ইহা আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি যেন ইহা জন্মগত (innate)—প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (*a priori*)।

যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন আমাদিগের দেশের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ জন্মগত জ্ঞান। এই মতও দুই প্রকারের, কেহ কেহ বলেন যে ইহা কেবল বিষয়িগত (subjective), ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে। আমাদিগের মনের বাহিরে দেশ বলিয়া কোন প্রকৃত সত্তা নাই। ইহার সাহায্যে আম[illegible] আমাদিগের প্রত্যয় সকলকে আকার দেই মাত্র।

আর এক শ্রেণীর যুক্তিবাদী আছেন যাহারা বলেন যে আমাদিগের দেশের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (*a priori*) হইলেও ইহা কেবল বিষয়িগত (subjective) নহে আমাদিগের মনের বাহিরেও ইহার অস্তিত্ব আছে। ইহা একটি প্রকৃত সত্তা।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মতে দেশ, দ্রব্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত অন্য দ্রব্যের ন্যায় ইহাও দৈর্ঘ, প্রস্থ, গতি প্রভৃতি গুণের

আশ্রয়। ইহা একটি প্রকৃত সত্তা—কেবল বিষয়িগত সত্তা নহে। বিষয়িনিরপেক্ষ ভাবেও ইহার অস্তিত্ব আছে।

দেশের ন্যায় কাল সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদিগের মত এই যে ইহার জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ (*a posteriori*)। যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটিবে বলিয়া আশা করি, তাহা হইতেই আমরা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করি। ইহাই কালের জ্ঞান। যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ ইহার বিরুদ্ধে এই বলেন যে, কালের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা ঘটনা নিচয়ের পৌর্বাপর্য জ্ঞান-লাভ করি। সুতরাং ঘটনা নিচয়ের পৌর্বাপর্য জ্ঞান হইতে কালের জ্ঞান লাভ হয়, এই কথা চক্র যুক্তি দোষদুষ্ট। তাঁহারা বলেন, দেশের জ্ঞানের ন্যায় কালের জ্ঞানও আমাদিগের জন্মগত (innate)—প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ (*a priori*)। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে ইহা কেবল বিষয়িগত (subjective) এবং কাহারও কাহারও মতে বিষয়ি-নিরপেক্ষ ভাবেও ইহার অস্তিত্ব আছে।

ক্রমবিকাশবাদী স্পেন্সার বলেন যে, দেশের জ্ঞানের ন্যায় ইহাও ক্রমবিকাশের ফল (evolutional)। গোড়াতে ইহা প্রত্যক্ষমূলকই ছিল; বংশ পরম্পরায় ইহা আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, যেন ইহা জন্মগত (innate)।

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ (হিউম, মিল বেইন প্রভৃতি) বলেন যে, কার্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক

(*a posteriori*) ইহা ঘটনানিচয়ের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু নহে। যে ব্যাপারটাকে কার্য বলি, তাহা ঘটিবার পূর্বে, অন্য অবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে, নিয়তই (invariably and unconditionally) যাহা তাহার পূর্বে ঘটে, তাহাকেই তাহার কারণ বলি। কারণ কোনো শক্তিদ্বারা কার্য ঘটায়, ইহা কেহ কখনও দেখে নাই। লৌহ উত্তপ্ত হইলে ইহার বিস্তার বৃদ্ধি পায়। উত্তাপ এবং বিস্তার-বৃদ্ধি, ইহারা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য; কিন্তু উত্তাপ বিস্তার বাড়ায়, ইহা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। উত্তাপ-বৃদ্ধি পূর্ববর্তী ঘটনা, এবং বিস্তারবৃদ্ধি পরবর্তী ঘটনা, এইমাত্রই আমরা জানি। এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন অপরিহার্য সম্বন্ধ (necessary connection) আছে ইহা কেহ কখনও দেখে নাই এবং ইহাকে কারণের অপরিহার্য অংশ মনে করিবারও কোনও কারণ নাই।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মতও কতকটা এইরূপ। তাহাদিগের দেওয়া কারণের লক্ষণ হইয়াছে 'কার্যনিয়তপূর্বভাবিত্বং কারণত্বম্।' নিয়তই অর্থাৎ সর্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া যাহা কার্যের পূর্বে থাকে তাহাই কার্যের কারণ। যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ বলেন, কেবল যে কারণ কার্যের পূর্বে থাকে তাহা নহে, ইহা, ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাই কার্য ঘটায় এবং ইহার জ্ঞান, আমরা প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ ভাবেই লাভ করি। আমরা যখনই কোন কার্য করি, তখনই জানি যে আমরা শক্তি প্রয়োগ করিয়াই ইহা করিয়া থাকি। আমি হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া একখণ্ড মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।

আঘাত এবং মৃত্তিকাখণ্ডের ভগ্ন হইয়া যাওয়া অবশ্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার, কিন্তু কেবল মৃত্তিকাখণ্ডের উপর আমার হস্তের পতনই ইহার কারণ নহে। আমি প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ ভাবেই জানি যে, আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করিয়াই, মৃত্তিকাখণ্ড ভগ্ন হইয়া যাওয়ারূপ কার্য ঘটাইয়াছি। এই শক্তিই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে অপরিহার্য সম্বন্ধ (necessary connection) এবং ইহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (*a priori*)।

এই শক্তির স্বরূপ কি? বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা গতি (transference of motion)। কার্যের অর্থই হইল, কারণ, ইহার গতি কার্যে সংক্রামিত করে কিন্তু, কারণের এই লক্ষণ দ্বারা দেহ এবং আত্মার মধ্যে যে আদান প্রদান চলে তাহার ব্যাখ্যা হয় না। দেহের উত্তেজনায়, আত্মা বেদনা অনুভব করে; এবং আত্মার ইচ্ছায় দেহ সঞ্চালিত হয়। এই স্থলে, একের গতি অন্যে সংক্রামিত হওয়ার কথা উঠিতে পারে না। কারণ আত্মার কোনও গতি নাই। তাই কোনও কোন দার্শনিক বলেন যে, আমরা যখন কোন কার্য ঘটাই, তখন তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, ইহার গোড়াতে ইচ্ছারূপ শক্তি রহিয়াছে। ইহা হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, জগতে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে ইহাদিগের গোড়ায়ও একটা সর্বগ্রাহী ইচ্ছা (universal will) রহিয়াছে। ইহাই সকল কার্যের কারণ।

উক্ত হইয়াছে যে দেহের উত্তেজনা আত্মা অনুভব করে এবং আত্মার ইচ্ছায় দেহ সঞ্চালিত হয়। সুতরাং দেখা

যায় যে, ইহারা পরস্পরই পরস্পরের কার্য এবং কারণ। এই প্রকার সম্বন্ধকেই বলা হয় কার্যকারণের পারস্পারিকতা (reciprocal causality)। দার্শনিক হেগেল বলেন, যে স্থলে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে সেই স্থলে পারস্পারিকতা (reciprocity) ও আছে। যখন আমরা বলি যে ক, খ এর কারণ, তখন ইহাও বলি যে খ, ক এর কারণ হইবার কারণ। খ, কার্য না হইলে ক, কারণও হইতে পারে না, এই অর্থে এখানেও পারস্পারিকতা (reciprocity) বর্ত্তমান। খ এর কার্য হইবার কারণ ক, এবং ক এর কারণ হইবার কারণ খ।

মোটের উপর আমরা এই বলিতে পারি যে প্রত্যক্ষবাদী (empericist) দার্শনিকদিগের মতে, দ্রব্য দেশ, কাল এবং কার্য-কারণ-সম্বন্ধেরজ্ঞান, প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ (*a posteriori*)। যুক্তিবাদী (rationalistic) দার্শনিকদিগের মতে ইহা আমাদিগের জন্মগত – প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (*a priori*)। যুক্তিবাদী দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন আমাদিগের মনের বাহিরে দেশ কালের কোনও অস্তিত্ব নাই। ইহারা বিষয়িগত জ্ঞান মাত্র। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাদিগের অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরেও আছে—ইহারা কেবল বিষয়িগত নহে, ইহারা বিষয় (object) ও বটে; এবং বিষয়িনিরপেক্ষ ভাবে ইহাদিগের অস্তিত্বও আছে।

জানার সাপেক্ষিকতা।

(Relativity of Knowledge)

আমি যখন বলি 'আমি এই বস্তুটি জানি' তখন আমি এই বলি যে, ইহা আমার নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেই ভাবেই জানি। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানই জ্ঞাতা-সাপেক্ষ। আবার প্রত্যেক বস্তুই যে, সকল জ্ঞাতার নিকট একই ভাবে প্রকাশিত হয় তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এই জন্যই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগরাস্ বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতার নিকট যখন একই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন কোনও বস্তুরই প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ ইহা অন্য নিরপেক্ষ ভাবে কি, তাহা জানা যাইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জ্ঞানই তাহার জ্ঞানের মাপকাঠি। (the individual man is the measure of all things)।

আমাদিগের জ্ঞান যে কেবল জ্ঞাতা-সাপেক্ষ তাহা নহে। ইহা অন্য বস্তুর জ্ঞান-সাপেক্ষও বটে। আমি যখনই কিছু একটা জানি, ইহা অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনাই জানি। জানা কথাদ্বারা সর্ব্বদাই ইতর বস্তু হইতে পৃথকরূপে জানাই বোঝায়। জানা, পার্থক্যের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অতএব আমরা দেখিতে পাই আমাদিগের প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানই যে কেবল জ্ঞাতা-সাপেক্ষ তাহা নহে, ইহা অন্য বস্তুর জ্ঞান-সাপেক্ষও বটে। সুতরাং, আমাদিগের প্রত্যেক জ্ঞানই

সাপেক্ষিক (Relative)। জ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদিগের এই মত তাহাদিগকে বলা হয় সাপেক্ষজ্ঞানবাদী (Relativists)।

এখন একটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উঠে। তাহা এই ঃ—দর্শনের লক্ষ্য হইল পারমার্থিক তত্ত্ব জানা। যাহা পারমার্থিক, তাহা সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ (absolute)। জ্ঞান মাত্রই যখন সাপেক্ষিক, তখন যাহা সর্ব্বনিরপেক্ষ তাহাকে জানা সম্ভব হইবে কিরূপে? প্রোটাগরাস্, স্পেন্সার্ বেইন্, হেমিল্টন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ মনে করেন যে, সর্ব্বনিরপেক্ষ কোনও সত্তা হয়ত বা আছে, হয়ত বা নাই; কিন্তু ইহাকে জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা মনে করেন ইহা থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে তাঁহারা সন্দেহবাদী (Sceptic)। আর যাঁহারা বলেন, ইহা আছে কিন্তু ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (Unknown and unknowable) তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)।

দার্শনিক হেমিল্টন্ বলেন কোনও একটা বস্তুকে জানিতে হইলেই, ইহাকে একটা অবস্থার (Condition এর) মধ্যে আনিতে হয়। সুতরাং, যাহা সর্ব্ব অবস্থা নিরপেক্ষ (Unconditioned), তাহাকে অবস্থার মধ্যে আনা যায়, ইহা ত এক অর্থশূন্য কথা। আমরা যখন কোনও বস্তুকে জানি, তখন ইহাকে অন্যের সঙ্গে তুলনাই জানি—অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই জানি। ইহার অর্থই এই যে, ইহাকে সীমার মধ্যে আনিয়াই জানি। অসীমকে সীমার মধ্যে

আনা অর্থশূন্য কথা। সুতরাং, যাহা অসীম, সর্ব্বনিরপেক্ষ (infinite, absotute) তাহাকে জানিবার কোনোও উপায় নাই। ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। (Unknown and unknowable)।

যুক্তিবাদী (Rationalistic) দার্শনিকগণ এই কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদিও আমাদিগের জ্ঞান সাপেক্ষিক তথাপি আমরা সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তার কোনও জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, এই কথা ঠিক নহে। আমরা এমন কোনও একটা ভাব মনে আনিতে পারি না যাহার সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধ ভাবও মনে না আসে। এই প্রকার ভাবযুগলকে বলা হয় প্রতিযোগী ভাব, (Corelative ideas) অথবা দ্বন্দ্বের ভাব (Polarities of ideas)। নিরপেক্ষ, সাপেক্ষ ; ব্যবহারিক, পারমার্থিক ; অসীম, সসীম ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি প্রতিযোগী ভাব। ইহাদিগের কোনও একটির কথাও ইহার প্রতিযোগীকে বাদ দিয়া আমরা মনে আনিতে পারি না। যখন সসীমকে জানি, তখন যে ইহাকে অসীম হইতে ভিন্ন বলিয়াই জানি, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অসীমের কতকটা জ্ঞান না থাকিলে, সসীমকে অসীম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিব কিরূপে ? অসীমের সঙ্গে তুলনাতেই সসীমকে জানি। তেমন, যখনই কোনও বস্তুকে অনিত্য বলিয়া জানি, তখন নিত্য বলিতে কি বোঝায়, তাহারও যে কতকটা জ্ঞান আছে, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ নিত্যের সঙ্গে তুলনাতেই আমি আনিত্য কি তাহা জানি। সেইরূপ ব্যবহারিক সত্তার

(Phenomenon এর) জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পারমার্থিক সত্তারও (Noumenon) জ্ঞান থাকে। জ্ঞাতা হইতে হইলে জ্ঞেয়েরই জ্ঞাতা হইতে হয়, এবং জ্ঞেয় হইতে হইলেও জ্ঞাতারই জ্ঞেয় হইতে হয়, একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কথা মনে আনা যায় না। সাপেক্ষের (Relative এর) জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই নিরপেক্ষেরও (absolute এর) জ্ঞান থাকে। এমন কি সাপেক্ষের জ্ঞানের জন্য, নিরপেক্ষের কতকটা জ্ঞান পূর্ব্বেই থাকা প্রয়োজন (a prior logical condition)। সুতরাং, আমরা যে কেবল নিরপেক্ষকে জানি তাহা নহে, সাপেক্ষকে জানিবার পূর্ব্বেই ইহাকে জানি। স্পেন্‌সার্‌ও স্বীকার করেন যে সাপেক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিরপেক্ষকেও জানি, কিন্তু এই জানার পরিসর অতি সামান্য। ইহা আছে এই মাত্র জানি। ইহার স্বরূপ কি তাহা কিছুই জানিতে পারি না। যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, আমরা ইহার স্বরূপও কতকটা জানিতে পারি। নতুবা, সাপেক্ষের সহিত তুলনামূলক জানার কোনও অর্থ থাকে না।

এই কথাটি, ভারতীয় উপনিষদে যে দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহাতে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তা ব্রহ্মকে বেশ জানি বলিয়া যে বলে, সে তাঁহাকে কিছুই জানে না। যে বলে আমি ইঁহাকে জানি না, সেও জানে না। যে বলে জানি না ইহাও বলিতে পারি না, এবং জানি ইহাও বলিতে পারি না সেই ঠিক জানে।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

কেনোপনিষৎ।

ইহার অর্থ এই যে, যাহা সর্ব্বনিরপেক্ষ অসীম তাহার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান ত সম্ভবপরই নহে। তাহাকে জানার অর্থ হইয়াছে তাহাকে কতকটা মাত্র জানা।

তত্ত্বনিরূপণ প্রণালী।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালী।

সত্যনিরূপণের প্রণালী দুই প্রকার—বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং দার্শনিক প্রণালী। পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ (Induction) হইয়াছে বৈজ্ঞানিক প্রণালী। ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা, এক বা একাধিক সত্তাকে আদিকারণ কল্পনা করিয়া তাহা হইতে জগৎব্যাপার ব্যাখ্যার নাম দার্শনিক প্রণালী (speculative method)। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই দুই প্রণালী পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন নহে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও কল্পনা (hypothesis) আছে—অবশ্য পরীক্ষা যোগ্য কল্পনা—এবং দার্শনিক প্রণালীতেও পর্য্যবেক্ষণ আছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীও সর্ব্বপ্রকারে কল্পনাবর্জ্জিত নহে; এবং দার্শনিক প্রণালীও সর্ব্বপ্রকারে পর্য্যবেক্ষণ বর্জ্জিত নহে।

জগতে চিৎও আছে, অচিৎও আছে, এবং ইহা দেখিয়াই দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ বা একটিকে, কেহ বা অপরটীকে, এবং কেহবা উভয়কেই আদিকারণ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং ইহার সাহায্যে পরিদৃশ্যমান জগৎব্যাপার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কেবল পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ এবং কল্পনা দ্বারা বিচার করিলে, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রণালীর মধ্যে সীমারেখা টানা সহজ ব্যাপার হইবে না। ব্যাপ্তিগ্রহ (Induction) যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রাণ, ইহাকেও এক প্রকার কল্পনাই বলা যায়। যে কয়েকটি স্থলের পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক একটী ব্যাপ্তি নিরূপন করা হয়, ব্যাপ্তি বাক্যের অন্তর্ভূত সকল স্থলের তুলনায় তাহাদিগের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং এক অর্থে এক একটী ব্যাপ্তি এক একটী কল্পনা বই আর কিছু নহে। তবে অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল কল্পনার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও সন্দেহের উদয় হয় না। তাহা হইলেও যাহা কল্পনা তাহা কল্পনাই।

আর এক কথা এই, বৈজ্ঞানিক কল্পনা (hypothesis) এবং দার্শনিক কল্পনার (speculation এর) মধ্যে যে পার্থক্য, ইহা পরিমাণগত যতটা, ভাবগত ততটা নহে। দার্শনিক কল্পনার লক্ষ্য হইয়াছে সমগ্র জগৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা; বৈজ্ঞানিক কল্পনার লক্ষ্য, বিজ্ঞানের কোনও এক শাখার সহিত সংস্পৃষ্ট ব্যাপার সকলের ব্যাখ্যা।

প্রাচীন যুগের দার্শনিক থেইল্‌স্ (Thales) যে সলিলকে জগতের আদিকারণ বা পারমার্থিক তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ইহারও গোড়াতে পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ ছিল। জগতে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় তিন শ্রেণীর বস্তু দেখিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যাহা আদিকারণ, তাহাতে এই তিন অবস্থায় থাকার শক্তি থাকিতেই হইবে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একমাত্র সলিলকেই এই তিন অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সলিলই আদিকারণ। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ এবং যুক্তিতে দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার দার্শনিক মত পর্য্যবেক্ষণমূলক যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সক্রেটিস্ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এবং সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামিশি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য তাহা, সকলের মধ্যে যে একত্ব রহিয়াছে তাহার সঙ্গে তুলনায় অতি সামান্য। এই একত্বই বিশ্বমানবতা। ইহা সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ এবং স্থায়ী। এই বিশ্বমানবতা বা মনুষ্যত্ব নিরূপণের গোড়াতেও ছিল পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তি গ্রহ। সক্রেটিসের এই বিশ্বমানবতার অস্তিত্বের আভাস হইতেই প্লেটোর ভাব জগতের (ideas of universals এর) বাস্তবতার কল্পনা। সুতরাং যুক্তিবাদী প্লেটোর দার্শনিক মতেরও মূলেতে পর্য্যবেক্ষণ এবং জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কতকটা ব্যাপ্তিগ্রহ (induction) যে না ছিল তাহা নহে।

হিরাক্লিটাস্ যে পরিবর্ত্তন প্রবাহকে পারমার্থিক তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহারও গোড়াতে ছিল পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ। জাগতিক বস্তুসকল হয় তেজ, না হয় মরুৎ, না হয় অপ, না হয় মৃত্তিকা (earth), অর্থাৎ হয় আগ্নেয় না হয় বায়বীয়, না হয় তরল, না হয় কঠিন, তাঁহার এই যে সিদ্ধান্ত তাহার গোড়াতেও ছিল পর্য্যবেক্ষণই। ইহাদিগের মধ্যে যে অবিরাম পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহাও তিনি নিরূপণ করিয়াছিলেন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই; অবশ্য, তেজ, মরুতে, মরুৎ জলে, এবং জল ক্ষিতিতে, আবার ক্ষিতি তেজ, তেজ মরুতে, মরুৎ জলে, জল ক্ষিতিতে যে বৃত্তাকার গতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা ছিল তাঁহার কল্পনা; কিন্তু এই কল্পনার গোড়াতেও যে কতকটা পর্য্যবেক্ষণ ছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল হইতে স্পষ্টই মনে করা যাইতে পারে যে, দার্শনিক গবেষণাও সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ বর্জ্জিত নহে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাও সর্ব্বতোভাবে কল্পনা বর্জ্জিত নহে।

দার্শনিক কোঁত বলেন, কল্পনা দ্বারা কখনও সত্য জানা যায় না। যাহা মূলেতে কল্পনা তাহা সর্ব্বদা কল্পনাই থাকিবে। ইহা কখনও নিঃসন্দিগ্ধাবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে না। তাঁহার মতে, সত্যনিরূপনের প্রণালী হওয়া উচিত এইরূপ, যেন ইহা দ্বারা আমরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য জানিতে পারি। তাহার প্রবর্ত্তিত সত্য নিরূপন প্রণালীর নাম নিঃসন্দিগ্ধবাদ (positivism)। এই মতবাদীদিগের কথা

এই :—বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে, বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার মৌলিক নিয়ম সকল নিরূপণ করিতে হইবে, এবং তৎপর তাহাদিগের সংশ্লেষণ (synthesis) দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে এক সাধারণ ভূমিতে দঁড়াইতে হইবে। এই সাধারণ ভূমির সাহায্যে জগৎ ব্যাপার ব্যাখ্যা করিলে, ইহাতে কোনও সন্দেহ বা কল্পনার স্থান থাকিতে পারে না।

কোঁত বলেন, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাকেই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া আসিতে হয়, ধর্ম্মের অবস্থা, দর্শনের অবস্থা এবং নিঃসন্দিগ্ধাবস্থা (Religious, speculative and positive stages)। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা ভাবা হউক। প্রাচীনকালে মানুষ গ্রহনক্ষত্রদিগকে দেবতা বলিয়া মনে করিত। ইহা ধর্ম্মের অবস্থা। তাহার পর আসিল দার্শনিক কল্পনার দিন। দার্শনিকগণ মনে করিলেন, ঈশ্বর স্থন্দর এবং পূর্ণ, তাই তাঁহার সৃষ্ট জগৎও স্থন্দর এবং পূর্ণ। আকারের মধ্যে গোলাকার এবং গতির মধ্যে বৃত্তাকারে ভ্রমণই স্থন্দর এবং পূর্ণ। এইজন্যই গ্রহনক্ষত্রাদির আকার গোল এবং গতি বৃত্তাকারে। এখন জ্যোতির্বিজ্ঞান সন্দেহরহিত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি এবং আকার, কারণ সহ নির্ণীত হইয়াছে। এখন কেহ আর এই সকলকে দেবতা মনে করে না। এই সকলের বিষয়ে, কোনও দার্শনিক গবেষণায়ও কালক্ষেপণ করে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, গণিত বিজ্ঞান ব্যতীত, বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধেই অল্প বিস্তর তাহা সত্য। সম্ভবতঃ গণিত বিজ্ঞান গোড়া হইতেই নিঃসন্দিগ্ধাবস্থায় আছে। কেহ কোনও দিন তিনবার তিন, নয় না হইয়া দশ হইবার জন্য, অথবা ত্রিভুজের তিন কোণ দুই সমকোণের সমান না হইয়া কম বা বেশি হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা বা কল্পনা করে নাই। কোঁত মনে করেন যে, বর্ত্তমানে এক সমাজ বিজ্ঞান (sociology) ব্যতীত আর সকল বিজ্ঞনই নিঃসন্দিগ্ধাবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। আশা করা যায় যে, সমাজ বিজ্ঞানও শীঘ্র এই অবস্থা লাভ করিবে ; এবং তখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিরূপিত সকল প্রকার মৌলিক তত্ত্ব সকলের সংশ্লেষণ দ্বারা এমন এক তত্ত্ব নির্ণীত হইবে যে, ইহার সাহায্যেই সকল প্রকার জগৎ ব্যাপার নিঃসংশয়ে ব্যাখা করা যাইতে পারিবে এবং দার্শনিক কল্পনার দিনও শেষ হইয়া যাইবে।

কোঁতের এই আশা ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ তাহার কথামতেই এখনও সমাজ বিজ্ঞান সংশয়-রহিতাবস্থায় আসিয়া পৌছায় নাই। বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখা—যেমন জীবন বিজ্ঞান (Biology), প্রাণী বিজ্ঞান (Zoology), এমন কি ভূত বিজ্ঞানও (Physics) যে সকল বিষয়ে সংশয়রহিতাবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ব্যবহারিক (Phenomenal) সত্তাতে

আবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে লব্ধ মৌলিক নিয়মসকলের সংশ্লেষণজন্য জ্ঞানও ব্যবহারিক সত্তার সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না। সুতরাং দার্শনিক গবেষণার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, এই কথা সত্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে, ইহা আদিকারণ কি এবং ইহার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, তাহা জানিতে চায়। যত-দিন মানুষ মানুষ থাকিবে, ততদিন দার্শনিক কল্পনাও থাকিবে। মানুষের স্বভাবই দার্শনিক ছাঁচে গঠিত।

সভ্যই হউক, আর অসভ্যই হউক, শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে মানুষ এই সৃষ্টি রহস্যটা জানিতে চায়—এই জগতের আদিকারণ কি, ইহা কোথা হইতে আসিল, ইহার পরিণাম কি, এই সকল প্রশ্ন সকলেরই মনে উদয় হয় এবং সকলই ইহার একটি না একটি উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারে না। মানুষে মানুষে পার্থক্য দার্শনিক ভাবের মানসিক বৃত্তি লইয়া নহে—মানুষমাত্রই দার্শনিক (Philosopher) ; পার্থক্য হইয়াছে চিন্তার ধারা লইয়া—প্রশ্নটির উত্তরের তারতম্য লইয়া—যুক্তির সূক্ষ্মতা এবং স্থূলতা লইয়া—পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষা এবং ব্যাপ্তিগ্রহের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা লইয়া। অজ্ঞ ব্যক্তি একটা যাহা তাহা উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকে, জ্ঞানীর নিকট যে উত্তর আসে, জ্ঞানী তাহা পরীক্ষা করিয়া সূক্ষ্ম বিচারের ছাঁচে ফেলিয়া দেখে ইহা গ্রহণযোগ্য কিনা, গ্রহণযোগ্য হইলে গ্রহণ করে ; অযোগ্য হইলে পরিত্যাগ করে। মনুষ্যমাত্রই

দার্শনিক হইলেও কেহ জ্ঞানী দার্শনিক এবং কেহ অজ্ঞানী দার্শনিক। একজন দার্শনিক বলিয়াছেন, মানুষ দার্শনিক গবেষণা করিবে কিনা—প্রশ্ন ইহা নহে। মানুষের স্বভাবই তাহাকে দার্শনিক চিন্তায় লইয়া যায়। প্রশ্ন হইয়াছে, চিন্তার ধারাটা কি হওয়া উচিত তাহা লইয়া—কোন্ ধারায় চিন্তা করিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা লইয়া। (All men philosophise—whether a man should philosophise or not, is not the question. The question is, how to philosophise correctly.) তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সকল সত্য নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত সামঞ্জস্যবর্জ্জিত কোনও দার্শনিক কল্পনাই তত্ত্বান্বেষীদিগের নিকট আদরনীয় হইবে না।

প্রমাণসমালোচনানিরপেক্ষ (Dogmatic) ও প্রমাণসমালোচনা সাপেক্ষ (Critical.) প্রণালী।

আর একভাবেও দার্শনিক গবেষণার প্রণালীর শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহারা জানা কি, জানিবার উপায় কি এবং পারমার্থিক তত্ত্ব জানিবার জন্য আমাদিগের সামর্থ্যই বা কতটুকু, এই সকল পূর্ব্বে বিচার না করিয়াই পারমার্থিক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। দার্শনিক গবেষণার এই প্রণালীর নাম সমালোচনা-নিরপেক্ষ প্রণালী

(Dogmatic method)। প্রাচীন যুগের ইউরোপীয় দার্শনিকগণ প্রায় সকলেই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কাহারও এইরূপ মনে করা উচিত হইবে না যে, প্রাচীন যুগের দার্শনিক মতসকল প্রমাণ-নিরপেক্ষ। এই সকল মতও সুযুক্তিমূলক এবং যথাসম্ভব প্রমাণমূলক। এই সকল দর্শনেও প্রমাণের ব্যবহার হইয়াছে ; প্রমাণ কি, তাহার স্বরূপ কি এবং তাহার দৌড়ই বা কতটুকু, এই সকল কথা উপোদ্‌ঘাতস্বরূপে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, এইমাত্র। প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা না করা এবং প্রমাণের ব্যবহার না করা এক কথা নহে।

এই প্রণালীর দার্শনিক গবেষণার ফলে যখন দার্শনিকগণ পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এমন কি বিপরীত মতও পোষণ করিতে লাগিলেন, তখন এইরূপ এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল যাহাদিগকে বলা হইত তার্কিক (sophists)। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে দার্শনিক গবেষণা বাতুলতা মাত্র ; ইহা দ্বারা জগতের কোনও মঙ্গল সাধিত হয় না ; বরং, যাঁহারা দার্শনিক গবেষণা করেন, তাঁহারা যদি কি উপায়ে জনসাধারণের সুখ বৃদ্ধি হয় তাহার গবেষণা করেন, তবে তাঁহাদিগের শ্রম সফল হয়। বলাই বাহুল্য ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল সন্দেহবাদ (scepticism)। এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে পারমার্থিক তত্ত্ব জানা সম্ভব কিনা এই বিষয়ে প্রকৃতই সন্দেহের উদয় হইল। যাঁহারা মনে এই সন্দেহ পোষণ করেন তাহা-

দিগকে বলা হয় সন্দেহবাদী (sceptic)। কিন্তু সন্দেহের জন্য কেহ সন্দেহ করে না। সন্দেহ নিরসনেরও চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলই হইল সমালোচনা (Criticism)। প্রমাণ-বিচারবর্জ্জিত দার্শনিক গবেষণার (Dogmatism এর) ফল সন্দেহবাদ (scepticism) এবং সন্দেহবাদের ফল সমালোচনা (Criticism)।

ইংলণ্ডের দার্শনিক লক এবং হিউম, সমালোচনার সূত্রপাত করেন। হিউমের সমালোচনার ফল এই হইল যে, তাঁহার মতে আমাদিগের সমস্ত জ্ঞানই সংবেদন (sensation) মূলক। প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ ভাবে (apriori) আমরা কোনও জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যাঁহারা কেবল সংবেদনকেই জ্ঞানলাভের উপায় মনে করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় সংবেদন বিজ্ঞানবাদী (sensationalist)। তাহাদিগের মতের নাম সংবেদন বিজ্ঞানবাদ বা (sensationalism)। সংবেদন ব্যবহারিক (phenomenal) জগতের সীমা ছাড়াইতে পারে না। সুতরাং, ইহাকে ব্যবহারিক সত্তাবাদ বা (phenomenalism) ও বলা হয়। সংবেদনমূলক জ্ঞান ব্যবহারিক সত্তার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং হিউমের সমালোচনাও তাহাকে সন্দেহের সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারিল না। তিনি সন্দেহবাদীই রহিয়া গেলেন।

হিউমের পর সমালোচনার সূক্ষ্মভাবে পুষ্টিসাধন করেন ক্যান্‌ট। ক্যানটের সমালোচনা সূক্ষ্মতর। প্রকৃত প্রস্তাবে.

সাধারণতঃ ক্যাণ্টকেই সমালোচনামূলক দার্শনিক গবেষণা প্রণালীর প্রবর্ত্তক মনে করা হয়।

হিউমের সহিত এক মত হইয়া ক্যাণ্টও বলেন যে, আমাদিগের জ্ঞানের উপাদান (ideas) সকল আমরা সংবেদন (sensation) হইতেই পাই। কিন্তু ইহারা আকারশূন্য। দেশ, কাল, দ্রব্য এবং কার্য্যকারণসম্বন্ধজ্ঞান আমাদিগের জন্মগত (innate)—প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (apriori)। এই সকল জন্মগত জ্ঞানের সাহায্যে, আমরা সংবেদনজন্য জ্ঞান সকলকে আকার দেই এবং আমাদিগের বুদ্ধি এই সকলকেই সাজাইয়া গুছাইয়া ব্যাপকতর জ্ঞানে উন্নিত করে। কিন্তু ইহার বেশি আর কিছু করিতে পারে না। গোড়াতে সকল জ্ঞানই সংবেদনমূলক। সুতরাং আমাদিগের সকল জ্ঞানই ব্যবহারিক বা phenomenal জগতে আবদ্ধ। অতএব যাহা পারমার্থিক (thing in itself) তাহার স্বরূপ জানা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। মোটের উপর ইহাই ক্যাণ্টের "Critique of Pure Reason" এর উপসংহার।

তবে কি ক্যাণ্ট সন্দেহবাদী ছিলেন? তাঁহার সমালোচনার পরিণতি কি সন্দেহবাদ? ক্যাণ্টের "Critique of Pure Reason" পাঠ করিলে ইহাই মনে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তিনি পুরোপুরি সন্দেহবাদী ছিলেন না। "Critique of Practical Reason"এ, তিনি বলেন যে, কেবল অনুভব এবং চিন্তাই আমাদিগের মনের একমাত্র বৃত্তি নহে। এই দুইটি

ছাড়া ইহার একটি নৈতিক বৃত্তিও (moral faculty) আছে। এই moral faculty বা বিবেকই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে ঈশ্বরও আছেন, জগৎও আছে এবং জীবও আছে। আমরা অমর এবং আমাদিগের নৈতিক দায়িত্বও আছে। তবে এই সকল স্বরূপতঃ (in themselves) কি তাহা আমাদিগের জানিবাব কোনও উপায় নাই।

অতএব দেখা যায় যে ক্যাণ্ট পুরোপুরি সন্দেহবাদী ছিলেন না। তবে তাহাকে অজ্ঞেয়বাদী বা agnostic বলিলে কথায় ভুল হইবে না।

তর্কের প্রণালী (Dialectic Method)।

দার্শনিক গবেষণার আর একটি প্রণালী আছে যাহাকে বলা হয় তর্কের প্রণালী (dialectic method)। তর্কও (dialectics) নানা প্রকার। এক প্রকার তর্কে, একই বিষয়ে দার্শনিকদিগের নানারূপ বিরুদ্ধ মত দেখাইয়া বলা হয় যে, ইহাদিগের একটিও ঠিক নহে। দার্শনিক গবেষণা বাতুলতা মাত্র। এই শ্রেণীর সমালোচকদিগকে বলে তার্কিক (sophist)। গ্রীক তার্কিক প্রোটাগোরাস্ এবং ভারতীয় চার্ব্বাকগণ ছিলেন এই শ্রেণীর সমালোচকদিগের অগ্রণী।

আর এক প্রকার তর্ক আছে, যাহাকে বলা হয় অসঙ্গতি প্রদর্শন (reductio ad absurdum) দার্শনিক জিনো ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রণালীতে, যে মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা প্রমাণ না করিয়া ইহার বিরুদ্ধ মত যে

মিথ্যা বা অসঙ্গত, তাহা দেখান হয়। দুইটি বিরুদ্ধ কথা এক সময়ে সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না। একটি সত্য বা মিথ্যা হইলে অপরটীকে মিথ্যা বা সত্য হইতেই হইবে। সুতরাং আমি যে মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তাহার বিরুদ্ধ মত যে মিথ্যা, ইহা দেখাইতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। জ্যামিতিক যুক্তিতে অনেক সময় এই প্রণালী অবলম্বিত হয়। সক্রেটিস্ এই প্রণালীর যুক্তিদ্বারা অনেক সময় তাঁহার প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত করিতেন। এই জন্য এই প্রণালীর একটি নাম হইয়াছে সক্রেটিসের বিদ্রূপ (Socratic irony)। সজ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, প্রায় সকল শ্রেণীর দর্শনেই অল্পবিস্তর এই প্রণালীর যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকার তর্ক আছে যাহাকে ভারতীয় দার্শনিক-দিগের ভাষায় বলা হয় মীমাংসা। ইহাতে এমন একটি মত স্থাপন করা হয়, যাহার সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত মতসকলের সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে। বেদান্ত দর্শন, মীমাংসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণের স্থল। বেদের পূর্ব্বাংশের নাম মন্ত্র এবং উত্তরাংশের নাম উপনিষৎ। এই উত্তরাংশেই ঋষিদিগের অপরোক্ষ জ্ঞানলব্ধ পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক বাক্য সকল সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকলকে বলা হয় শ্রুতি। আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যসকলের সামঞ্জস্য করাই বেদান্ত দর্শনের কার্য্য। বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত নাম উত্তর মীমাংসা। বেদের উত্তর অংশের অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যসকলের মীমাংসা

ইহাতে আছে বলিয়াই ইহাকে বলা হয় মীমাংসা দর্শন। ইয়ুরোপীয় দর্শনসকলের মধ্যে হেগেল্ প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতকে মীমাংসা দর্শন বলা যাইতে পারে। ইহাতে একভাবে না একভাবে, জড়তান্ত্রিকতা ও জ্ঞানতান্ত্রিকতার মধ্যে এবং বাস্তববাদ ও বিষয়িবিজ্ঞানবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

হেগেল্ এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা মনে করেন যে, এই মীমাংসার প্রণালী দ্বারা যে কেবল পারমার্থিক তত্ত্বের স্বরূপের জ্ঞান—অন্ততঃ কতক পরিমাণে—লাভ হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা সকল প্রকার সন্দেহেরও নিরসন হয়। অবশ্য ইহা তাঁহাদিগের মত ; ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কিনা তাহা অন্য কথা। হেগেলের তর্কের প্রণালী কতকটা এইরূপ। তাঁহার মতে, শেষ বিচারে সত্তা (being) এবং চিন্তা বা জ্ঞান (thought) একই বস্তু। সুতরাং আমরা যদি আমাদিগের চিন্তাধারার জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তবে যে কেবল বিকাশের ধারাও জানিতে পারি তাহা নহে, সত্তার জ্ঞানও কতকটা লাভ করিতে পারি।

আমাদিগের চিন্তার ধারা এইরূপ যে, ইহা ত্রিভঙ্গীতে অগ্রসর হয়। এই ত্রিভঙ্গী হইয়াছে সংস্থান (thesis), বিরোধ (antithesis), এবং সমন্বয় (synthesis)। চিন্তারধারায় প্রথম ধাপে যাহা সমন্বয় হইল পরের ধাপে তাহাই আবার সংস্থান হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহারও বিরোধের ভাব মনে পড়িল এবং সমন্বয়ও দেখা দিল। এই ভাবেতে আমাদিগের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়া ধাপে ধাপে

অগ্রসর হইয়া এমন এক অবস্থায় আসে যাহাতে আর বিরোধের অবকাশ থাকে না। যাহা চিন্তার এক নির্দ্বন্দ্বাবস্থা। ইহাই সর্ব্বনিরপেক্ষের জ্ঞান। ইহাই সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তা (absolute), অন্ততঃ সর্ব্বনিরপেক্ষের স্পষ্ট আভাস। যখন সত্তা (being) এবং জ্ঞান (thought) একই, এই চিন্তার ধারা হইতে আমরা জাগতিক বিকাশের ধারারও একটা সুস্পষ্ট আভাস পাই।

এই প্রকার তর্কের প্রণালী দ্বারা হেগেল, সমাজের, ধর্ম্মের এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বিকাশের ধারার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলেন, প্রাচ্যের ধর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছু না। আবার গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে মানুষের গৌরবই অধিক। ঈশ্বর বা ঈশ্বরসকলের গৌরব তত নহে। এই দুইয়ের সমন্বয় হইয়াছে খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মানুষে (God manএ)। ধর্ম্মের ইহাই সর্ব্বোচ্চ এবং শেষ কথা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তিনি বলেন কোনও কোনও রাষ্ট্রে রাজাই সব, প্রজারা কিছুই নহে। আবার কোনও কোনও রাষ্ট্রে রাজার অস্তিত্বই নাই, প্রজাই সব। এই প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রদ্বয় বিরুদ্ধভাবের। ইহাদিগের সমন্বয় হইল নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিকতায়। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্র উহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। এই প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রই এই বিষয়ের উন্নতির চরম অবস্থা।

ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রত্যেকটিই অল্প বিস্তর সমালোচনামূলক। ইহারা একাধারে epistemology এবং

ontology। আস্তিক দর্শনই হউক, আর নাস্তিক দর্শনই হউক বা বৌদ্ধ দর্শনই হউক, সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক দর্শনের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে প্রমাণ এবং প্রমেয়—পারমার্থিক তত্ত্ব এবং ইহাকে অপরোক্ষভাবে জানিবার উপায়। তবে কোনও কোনওটিতে প্রমেয়ের উপর এবং কোনও কোনওটিতে প্রমাণের উপর ঝোঁক বেশি। সাংখ্য, বৈশেষিক প্রথম শ্রেণীর ন্যায়, পাতঞ্জল দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

তৃতীয় প্রকরণ।

পারমার্থিক সত্তা বিজ্ঞান (Ontology)।

সত্তার স্বরূপ ভেদে দার্শনিক মতভেদ।

জগতে আমরা দুইপ্রকার সত্তা দেখিতে পাই। চিৎ এবং অচিৎ—চেতন এবং জড়। দার্শনিকদিগের নিকট প্রশ্ন হইল এই :—আদিকারণ (ultimate reality) কি চিৎ না অচিৎ ; না চিৎ এবং অচিৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্য কোনও সত্তা ? চিৎই হউক, বা অচিৎই হউক, ইহা কি এক, না, একাধিক ? ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক, ইহার উত্তর দিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে ; এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে উত্তর দিয়াছেন বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতেরও সৃষ্টি।

প্রাচীন যুগের ডিমক্রিটাস্ ও চার্ব্বাক এবং বর্ত্তমান যুগের হিউম, মিল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতে পারমার্থিক সত্তা অচিৎ বা জড়। যাহাকে আমরা চিৎ বলি, তাহা অচিতেরই কার্য্য। আমাদিগের আত্মা অচিৎ মস্তিষ্কেরই কার্য্যরূপ একটা চৈতন্য প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নহে। পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল দার্শনিকের এই মত, তাঁহাদিগকে বলা হয় অচিৎ বা জড়বাদী (materialist)। তাঁহাদিগের মতের নাম জড় বা অচিৎবাদ (materialism)।

জড়বাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, পারমার্থিক সত্তা, আয়তন বিশিষ্ট অসংখ্য পরমাণু। যাঁহাদিগের এই

মত, তাঁহাদিগকে বলা হয় পরমাণুবাদী (atomist) তাঁহাদিগের মতের নাম পরমাণুবাদ (atomism)। জড়বাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই পরমাণু সকল অবিভাজ্য জড়কনা নহে ইহাদিগের প্রত্যেকটিই, আয়তনশূন্য একটি শক্তিকণা বা কয়েকটি শক্তিকণা সমষ্টি। এই দার্শনিক মতের নাম শক্তিবাদ (dynamism)। যাঁহাদিগের এই মত তাঁহাদিগকে বলা হয় শক্তিবাদী (dynamist)।

যে সকল দার্শনিকের মতে পারমার্থিক তত্ত্ব চিন্ময় সত্ত্বা তাঁহাদিগকে বলা হয় চিৎবাদী বা জ্ঞানতান্ত্রিক (idealist)। তাঁহাদিগের মতের নাম চিৎবাদ বা জ্ঞানতান্ত্রিকতা (idealism) ইয়ুরোপের প্রাচীন যুগের পারমেনাইডিস্ ও প্লটিনাস্ এবং বর্ত্তমান যুগের বার্কলি, হেগেল্, শেলিং, ফিস্‌টে প্রভৃতি এবং ভারতীয় বৈদান্তিক দার্শনিক শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি এই শ্রেণীর দার্শনিক।

স্পিনোজা প্রমুখ কোনও কোন দার্শনিক মনে করেন যে, পারমার্থিক সত্তা একটি জ্ঞান ও বিস্তার (thought and extension) রূপ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য। যাহা গুণ এবং ক্রিয়ার আশ্রয় তাহাই দ্রব্য। এই প্রকার দার্শনিক মতের নাম দ্রব্যতান্ত্রিকতা (substantialism) এবং যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় দ্রব্যতান্ত্রিক (substantialist)।

ইয়ুরোপীয় প্লেটো, আরিষ্টটল্, ডেকার্ট এবং ভারতীয় কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ এবং মাধ্ব প্রভৃতি আর

এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহাদিগের মতে, চিৎ এবং অচিৎ, ইহারা উভই পারমার্থিক। এই দার্শনিক মতকে চিৎ অচিৎ বাদ, অথবা ভারতীয় দার্শনিকদিগের ভাষায়, প্রকৃতি পুরুষ বাদ বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই মতকে বলা হয় দ্বৈতবাদ (dualism)। ভাবের দিকে লক্ষ্য করিলে দ্বৈতবাদ কথাটি অপেক্ষা চিৎ অচিৎ বাদ কথাটি অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ প্রকাশক।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই পাই যে তত্ত্বের স্বরূপের ধারণা ভেদে, কোনোও কোনো দার্শনিক অচিৎবাদী (materialist); কোনোও কোনো দার্শনিক চিৎবাদী (idealist) ; কোনোও কোনো দার্শনিক চিৎ অচিৎ উভয়বাদী (dualist) এবং কেহ কেহ, চিৎ অচিৎ ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্রব্য বাদী (substantialist)

তত্ত্বের সংখ্যা ভেদে দার্শনিক মত ভেদ :

কোনো কোনো দার্শনিক বলেন পারমার্থিক তত্ত্ব এক অদ্বয় সত্তা। কেহ কেহ বলেন ইহা একাধিক সত্তা।

যে সকল দার্শনিক মনে করেন পারমার্থিক সত্তা এক অদ্বয় তত্ত্ব, তাঁহাদিগকে বলে অদ্বৈতবাদী (monist)। তাঁহাদিগের মতের নাম অদ্বৈতবাদ (monism)। যাঁহারা মনে করেন ইহা একাধিক, তাঁহাদিগকে বলা হয় বহুসত্তা বাদী (pluralist)। তাঁহাদিগের মতের নাম বহুসত্তা বাদ (pluralism)।

অদ্বৈতবাদ ঃ

অদ্বৈত বাদ দুই প্রকার। এক প্রকার অদ্বৈদ বাদ বলে যে, আদি কারণ যে কেবল এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সত্তা তাহা নহে, ইহাতে কোনোও বিকার বা রূপান্তরে পরিণতিও সম্ভব নহে। এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা—বিভ্রমদৃষ্টির (illusion এর) ফল মাত্র—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়। (গ্রীক দার্শনিক পারমেনাইডিস্ এবং ভারতীয় দার্শনিক শঙ্কর) ভারতবর্ষে এই মতকে বলে মায়াবাদ (Doctrine of illusion)। কোনোও দার্শনিক গ্রন্থে ইহাকে বলা হইয়াছে কেবলাদ্বৈতবাদ বা অখণ্ডাদ্বৈতবাদ (absolute monism)।

দ্বিতীয় প্রকারের অদ্বৈতবাদ মতে, যদিও পারমার্থিক তত্ত্ব এক অদ্বয় সত্তা, তথাপি, জগৎ মিথ্যা বা বিভ্রমদৃষ্টির ফল নহে। ইহা অদ্বৈত তত্ত্বেরই এক ভাবে না এক ভাবে অনুভবযোগ্য আকারের অভিব্যক্তি বা বিকাশ। (ইয়ুরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা, শেলিং, হেগেল্ বার্কলি এবং ভারতীয় রামানুজ, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য্য)। ভারতীয় দার্শনিকদিগের ভাষায়, এই মতকে বলা হয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (dualistic monism)। আদি কারণকে এক অদ্বয়তত্ত্ব বলা হয় বলিয়া ইহা অদ্বৈত, এবং ইহাতে স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয় বলিয়া ইহা দ্বৈত। অংশীর সহিত অংশের, গুণীর সহিত গুণের, শক্তিমানের সহিত শক্তির, দেহীর সহিত দেহের, বিকৃতের সহিত বিকারের, বিকাশের সহিত বিকশিতের যে ভেদ, তাহাকে বলা হয় স্বগত ভেদ।

ইয়ুরোপে এক সময়ে, এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা বাইবেলের ধর্ম্ম মত সকল (dogmas) যে যুক্তিসহ তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বলা হইত পণ্ডিত (schoolmen) আমরা তাঁহাদিগকে বলিব শাস্ত্র-তান্ত্রিক। শাস্ত্রতান্ত্রিকদিগের মতকে দার্শনিক মত মনে করিলে, আমরা বলিতে পারি যে তৃতীয় এক প্রকার অদ্বৈত বাদও আছে যাহাতে বলা হয় যে, আদি কারণ এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান চিন্ময় সত্তা—ঈশ্বর। জগৎ তাহার বিকাশ বা অভিব্যক্তি নহে। তিনি কোনোও এক সময়ে অবস্তু বা "কিছুনা" হইতেই (exnihilo) জীবাত্মা ও জড় উপাদান সৃষ্টি করিয়া এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। এখন যেমন আছে তেমনই সৃষ্টি করিয়া, ইহাকে কতকগুলি নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং এই জগৎ ব্যাপার এই সকল নিয়মানুযায়ী হইয়া চলিতেছে। কাহারও কাহারও মতে, ঈশ্বর নিজেও এই সকল নিয়মের অধীন হইয়া চলেন অর্থাৎ কখনও এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করেন না ; আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি নিজে এই সকল নিয়মের অধীন নহেন, কখনও কখনও লঙ্ঘন করিয়া থাকেন এবং এইরূপ করেন বলিয়াই অস্বাভাবিক ঘটনাও (miracles) ঘটে।

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মধ্যে, প্রাচীন যুগের দার্শনিক পারমেনাইডিস্, প্লটিনাস্, জিনো, বর্ত্তমান যুগের ইয়ুরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা, বার্কলি, শেলিং এবং হেগেল, ও ভারতীয়

দার্শনিক শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক এবং বল্লভাচার্য্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠাতা।

পারমেনাইডিস্ এবং শঙ্করের মতের মধ্যে সাদৃশ্য আশ্চর্য্য রকমের। শঙ্করের মত প্রতিষ্ঠিত শ্রুতি বাক্যের উপরে, পারমেনাইডিসের মত, তাঁহার গুরু জিনাফেনি পারমার্থিক তত্ত্বের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার উপরে। উভয়ের মতেই পারমার্থিক তত্ত্ব ব্রহ্ম এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সত্তা—"সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্।" ইহা একটি এক রস বস্তু ; ইহাতে কোনও প্রকার বিকার বা রূপান্তরে পরিণতির সম্ভব নাই। দৃশ্যমান জগৎ বিভ্রম দৃষ্টির ফল—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়। রজ্জু যেরূপ অবিকৃত থাকিয়াই সর্পভ্রম জন্মায়, অদ্বয় পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্মও তেমন, অবিকৃত থাকিয়াই জগৎ ভ্রম জন্মায়। ব্রহ্ম অপরিণামী—সর্ব্বপ্রকার ভেদ বর্জ্জিত (absolutely undifferentiated)। পারমেনাইডিসের লেখা কবিতায় এবং তাহারও অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে! সুতরাং তাঁহার লেখাতে শঙ্করের যুক্তির ন্যায় সুবিস্তৃত যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় না। কালগত ভাবে এই দুই দার্শনিকের মধ্যে ব্যবধান প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের, দেশগত ভাবে প্রায় চতুঃসহস্রাধিক মাইলের।

অন্যান্য অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, আদিকারণ ব্রহ্মেতে, স্বগত ভেদ আছে। ইহা পরিণামী।

জিনো এবং রামানুজের মতে, পারমার্থিক তত্ত্ব বিশ্বরূপ বিরাটদেহবিশিষ্ট দেহী। ইহাই মূর্ত্ত ঈশ্বর—এক বিরাট পুরুষ। প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই তাহার দেহেরই এক একটা অনুভবযোগ্য আকারের অভিব্যক্তি। পারমার্থিক তত্ত্বকে দেহবিশিষ্ট মনে করা হয় বলিয়াই রামানুজের দার্শনিক মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

স্পিনোজা বলেন পারমার্থিক তত্ত্ব জ্ঞান এবং বিস্তার (thought and extension) রূপ গুণ বিশিষ্ট এক সর্ব্ব-নিরপেক্ষ দ্রব্য। জাগতিক বস্তুমাত্রই এই দ্রব্যেরই এক একটা প্রকার (mode) মাত্র, সুতরাং জ্ঞান এবং বিস্তার অর্থাৎ জীবত্ব এবং জড়ত্ব বিশিষ্ট। চৈতন্য বর্জ্জিত জড় বলিয়াও কিছু নাই এবং জড়ত্ব বর্জ্জিত চৈতন্য বলিয়াও কিছু নাই। প্রত্যেক জড় মাত্রার সহিত এক একটা চৈতন্য মাত্রাও জড়িত আছে। জড়ত্ব এবং চৈতন্যের গতি সমান্তরাল। এই-জন্য তাঁহার মতের এক নাম সমান্তরাল বা সহচারবাদ (parallelism)।

শেলিং বলেন পারমার্থিক সত্তা জ্ঞান এবং বিস্তার বিশিষ্ট দ্রব্য নহে। ইহা এক সর্ব্বগ্রাহী ইচ্ছা। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়,—জীব এবং জড়—স্পিনোজার ভাষায়, জ্ঞান এবং বিস্তার (thought and extension), ইহার বিকিরণ (emanations)। ইহা ইহাদিগের উৎস।

এই স্থলে, আর একজন জার্ম্মেণ দার্শনিকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ছিলেন দার্শনিক সফেন্‌হর।

তাঁহার দার্শনিক মতের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি আরম্ভ করেন এই বলিয়া যে ধ্যানের সাহায্যে (apriori) সৃষ্টির আদিকারণ কি, তাহা নিরূপণ করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থাৎ পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তিগ্রহের (induction এর) সাহায্যে, জগৎ ব্যাপারের কারণানুসন্ধানে কতটা অগ্রসর হওয়া যায় তাহা নিরূপণ করাই আমার লক্ষ্য। আমার গবেষণার প্রণালী বৈজ্ঞানিক (aposteriori) দার্শনিক (apriori) নহে।

দার্শনিক ক্যাণ্টের সহিত একমত হইয়া তিনি স্বীকার করেন যে, আমরা বাহিরে যে নামরূপ জগৎ দেখি ইহার অস্তিত্ব, আমাদিগের মনের মধ্যে—জ্ঞাতা সাপেক্ষ। আমাদিগের ইন্দ্রিয় যে ভাবে গঠিত সেই ভাবে গঠিত না হইয়া অন্য ভাবে গঠিত হইলে, আমরা জগৎ ও অন্যরূপ দেখিতাম। জ্ঞাতার মনের বাহিরে জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব, প্রত্যক্ষ বা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায় না, ইহা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও আমাদিগের মনের বাহিরে যে বাস্তব জগৎ আছে—ইহার স্বরূপ যাহাই হউক না কেন—ইহাতে আমাদিগের মনে কোনোও সন্দেহের উদয় হয় না। শতযুক্তির বিরুদ্ধেও, নানা ভাবেই আমাদিগের মনে হয় যে, আমাদিগের মনের বাহিরে একটি বাস্তব জগৎ আছে। ইহা হয় কিরূপে? জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সর্ব্বতো-ভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ইহা সম্ভবপর হইত না। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ই আছে এবং উভয়ের মধ্যে সাধারণ কিছু একটা

আছে। এই যে সাধারণ একটা কিছু, ইহা হইয়াছে এক অপৌরুষের impersonal ইচ্ছা। যতদূর আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে আমরা এই বলিতে পারি যে, ইচ্ছাই সকল প্রকার জগৎ ব্যাপারের সার "essence"। ইচ্ছার পশ্চাতে কোনো তত্ত্ব থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। জগৎ ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্য ইচ্ছাই যথেষ্ট। ইচ্ছাই জগৎ সৃষ্টি করে, ইচ্ছাই ইহা পরিচালনা করে, ইচ্ছাই সকল অস্তিত্বের সার। ইচ্ছা কখনও সৃষ্টি করে সজ্ঞানে কখনও সৃষ্টি করে অজ্ঞানে। আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্য, ইচ্ছা অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকে। আমি যখন কোন কিছু ধরিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করি, তখন ইচ্ছার কার্য্য জ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। সজ্ঞাই হউক আর অজ্ঞাই হউক, ইচ্ছা একই। আমাদের মধ্যে, অবিশ্রান্তই ইহার কার্য্য চলিতেছে। শরীর এবং মনের ক্লান্তি আছে কিন্তু ইচ্ছার ক্লান্তি নাই। আমাদের নিদ্রিত অবস্থায়ও ইহার কার্য্য চলে, তাই আমরা স্বপ্ন দেখি। কেবল যে, শরীর গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছার কার্য্য চলে তাহা নহে, ইহা গঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইহা বর্ত্তমান থাকে। ইহার প্রয়োজন অনুসারে, ইচ্ছাই ইহার আকার এবং অবয়ব সৃষ্টি করে।

বুদ্ধি ইচ্ছারই কার্য্য। যখন ইচ্ছা, বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন ইচ্ছা কার্য্য করে সজ্ঞানে। তখনই ইহা হয় ব্যক্তি বা person। জ্ঞাতসারেই সৃষ্টি করুক বা অজ্ঞাতসারেই সৃষ্টি করুক, সকল সৃষ্টিতেই, ইচ্ছা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানু-

যায়ী হইয়াই সৃষ্টি করে। এইরূপ করে বলিয়াই, বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির নিয়ম (laws of nature) নিরূপণ করিতে পারেন। ইচ্ছার সৃষ্টির কতকগুলি আদর্শও আছে। এই আদর্শ সকলও ইচ্ছার ন্যায় অবিনশ্বর এবং অনাদি। সফেন্‌হরের আদর্শ সকলকে প্লেটোর জাতি বা ideas of the universalsএর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

শেলিংএর ইচ্ছার সঙ্গে সফেন্‌হরের ইচ্ছার পার্থক্য অনেক। সফেন্‌হর বলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে যতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন তাহাতে তিনি মনে করেন ইচ্ছাই জগৎ ব্যাপারের সার। তবে ইচ্ছার পশ্চাতেও কোনো পারমার্থিক তত্ত্ব থাকিতে পারে। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা যে পারমার্থিক ইহা তিনি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারেন নাই। শেলিংএর ইচ্ছা পারমার্থিক। সফেন্‌হরের ইচ্ছা, বুদ্ধি বা জ্ঞানের কারণ; শেলিংএর ইচ্ছা, জ্ঞানের উৎস সুতরাং জ্ঞানই। সফেন্‌হর তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অতিরিক্ত আদর্শেরও অস্তিত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা এক অদ্বয় তত্ত্ব নহে। শেলিংএর ইচ্ছা—এক অদ্বয় তত্ত্ব। আর এক কথা এই যে, যদিও সফেন্‌হর নিজে মনে করেন যে তাঁহার গবেষণা প্রণালী বৈজ্ঞানিক, তথাপি সকল বৈজ্ঞানিক যে তাঁহার অনুমান নির্দ্দোষ ব্যাপ্তিগ্রহ (induction) মূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে।

ভারতীয় দার্শনিক নিম্বার্ক, জড় এবং জীবকে পারমার্থিক সত্তার গুণ বা বিকাশ বা দেহ না বলিয়া বলেন যে, ইহারা

ইহার শক্তি, পারমার্থিক সত্তা কেবল নিষ্ক্রিয় জ্ঞান নহে, জ্ঞাতা এবং কর্ত্তাও বটে।

রামানুজ, নিম্বার্ক, স্পিনোজা এবং শেলিং এর মত বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাদিগের মতের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য যতটা ভাবগত পার্থক্য ততটা নহে। জীব এবং জড়জগৎ—ইহাদিগকে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ই বলি, বা জ্ঞান (thought) এবং বিস্তারই (extension) বলি, ইহারা একভাবে না একভাবে, যাহা পারমার্থিক তত্ত্ব, তাহার দেহেরই হউক বা গুণেরই হউক বা শক্তিরই হউক, অনুভব-যোগ্য আকারের অভিব্যক্তি। রামানুজ যাহাকে বলেন দেহ, স্পিনোজা তাহাকে বলেন গুণ, শেলিং বলেন বিকিরণ (emanations) এবং নিম্বার্ক বলেন শক্তি।

শেলিংএর দার্শনিক মত বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা বেবার (Weber) বলেন যে, ইহাতে আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া স্পিনোজাতেই আসিয়া পঁহুছি। রামানুজ এবং নিম্বার্কের মত বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তাহার ভাষার অনুকরণে বলিতে পারি যে, ইহাতে আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া স্পিনোজাতেই আসিয়া পঁহুছি। ইহা হইতে কাহারও মনে করা উচিত নহে যে, ইহা দ্বারা আমি এই বলিতে চাই যে, রামানুজ বা নিম্বার্কের দার্শনিক মত স্পিনোজার মতের ছাঁচে গঠিত। তাহা ত হইতেই পারে না, কেননা, এই দুই ভারতীয় দার্শনিকের সময়, স্পিনোজার সময়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে। কোনও কোনও বিষয়ে মতের

ঐক্য হইতে যদি মনে করিতে হয় যে একজনের মত, অন্য-জনের মতের ছাঁচে গঠিত, তবে ভারতীয় মতটিকেই ছাঁচস্থানীয় বলিতে হইবে। কারণ ইহা অন্য মতের অনেক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনচিন্তামূলক মতসকলের মধ্যে, পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই, কোনও কোনও বিষয়ে মিল থাকে।

হেগেলের মতে পারমার্থিক সত্তা এক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত সক্রিয় জ্ঞান (active thought)। জীব এবং জড়—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—ইহার বিকাশ। এই বিকাশপ্রবাহ অনাদি-কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এমন কি, এই বিকাশ প্রবাহই পারমার্থিক সত্তা—ঈশ্বর। ঈশ্বর, এই বিকাশ দ্বারাই, অর্থাৎ জীব ও জড়ের ভিতর দিয়াই, তিনি যে জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা তাহা অনুভব (realise) করেন; এবং বিকাশের উদ্দেশ্যও তাহাই। এই বিকাশ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহাতেই ঈশ্বর পর্য্যবসিত নহেন। তিনি ইহার বাহিরেও আছেন। পূর্ণভাবেই আছেন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"র মত। এই আদি কারণ সক্রিয় জ্ঞান (Active thought) হইলেও, ইহা পুরুষ (Personal) নহে; ইহা এক নির্গুণ বা Impersonal সত্তা।

ভারতীয় দার্শনিক বল্লভাচার্য্য বলেন পারমার্থিক তত্ত্ব ব্রহ্ম, এক সৎ চিৎ আনন্দরূপ সত্তা—"সত্যম্ জ্ঞানম্ আনন্দ-রূপম্"। তিনি তাঁহার যে অংশে, চিৎ ও আনন্দ অপ্রকট

রাখেন তাহা জড়; এবং যে অংশে কেবল আনন্দ অপ্রকট রাখেন তাহা জীব। অনাদি কাল হইতেই তাঁহার এই প্রকট অপ্রকট লীলা চলিয়া আসিয়াছে। ইহাই সৃষ্টি। তিনি এইরূপ করেন কেন? ইহা তাঁহার লীলা, হেগেলের ভাষায়, স্বভাব, উপনিষদের ভাষায়, "স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া"। ইহাতেই ব্রহ্ম পর্য্যবসিত নহেন। ইহার বাহিরেও তিনি আছেন। বল্লভাচার্য্য, ব্রহ্মে পরিণাম স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে, ইহা দ্বারা ব্রহ্মে কোনও বিকার জন্মে না। তিনি অবিকৃত থাকিয়াই রূপান্তরে পরিণত হন। এই-জন্য তাঁহার মতকে বলা হয় অবিকৃত পরিণামবাদ। অবশ্য কোনো সত্তা অবিকৃত থাকিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে কিনা, এই বিষয়ে দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

বল্লভাচার্য্য এবং হেগেলের মতের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, তাঁহাদের উভয়ের মতেই বিকাশ বা প্রকট অপ্রকট প্রবাহ ব্রহ্মদ্রব্যেরই, কেবল তাঁহার গুণ বা শক্তির নহে। এই বিকাশ বা প্রকট অপ্রকট, অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, অথচ ব্রহ্ম পূর্ণ ই আছেন; এবং ইহার বাহিরেও আছেন। পার্থক্য এই যে, হেগেলের পারমার্থিক তত্ত্ব এক সক্রিয় কিন্তু অপৌরুষেয় (Impersonal) জ্ঞান, বল্লভা-চার্য্যের অদ্বয় তত্ত্ব এক সক্রিয় জ্ঞাতা,—এক অদ্বয় পুরুষ (Personal being)।

বার্কলির মতও অনেকটা হেগেলের মতেরই ন্যায়। পার্থক্য এই যে, হেগেলের মতে বিকাশপ্রবাহ ব্রহ্মের

অপরিহার্য্য ; ইহাতেই তিনি মূর্ত্ত। বার্কলির মতে ইহা ব্রহ্মের অপরিহার্য্য নহে। ইহা না করিয়াও তিনি থাকিতে পারেন।

আমাদিগের আত্মা সম্বন্ধে একটি দার্শনিক মত এই যে, আত্মা যে, কেবল অনুভব করে, চিন্তা করে এবং ইচ্ছা করে তাহা নহে. এই সকল ইহার স্বভাব, ইহার অপরিহার্য্য। এই সকল অবস্থাযুক্ত আত্মাই মূর্ত্ত সত্তা। অন্যথা ইহা এক কাল্পনিক সত্তামাত্র। আর একটি মত এই যে, আত্মা অনুভব করে, চিন্তা করে এবং ইচ্ছা করে, ইহা সত্য, কিন্তু এই সকল ইহার অপরিহার্য্য নহে। এই সকল না করিয়াও আত্মা থাকিতে পারে, যেমন গভীর নিদ্রার সময়। এই দুইটি মতের মধ্যে যেরূপ ঐক্যানৈক্য, হেগেল এবং বার্কলির দার্শনিক মতের মধ্যেও সেইরূপ ঐক্যানৈক্য।

ইয়ুরোপের আর একটী অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন প্লটিনাস্। ইনি ছিলেন, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক যুগের শেষ দার্শনিক এবং কাহারও কাহারও মতে শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। যেমন একাডেমির দার্শনিক মত বলিতে প্লেটোর, এবং লিছিয়ামের দার্শনিক মত বলিতে আরিষ্টটলের দার্শনিক মত বোঝায়, তেমন আলেকজেণ্ড্রিয়ার দার্শনিক মত বলিতে প্লটিনাসের মতই লক্ষিত হয়। প্লটিনাসের দার্শনিক মতকে নব্য প্লেটনিক মত বলা হয় ; কারণ, ইহা প্লেটোর দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও পার্থক্যও অনেক।

প্লেটোর মতে, সামান্য বা জাতি (Ideas of universals) সকল বাস্তব সত্তা। ইহারা সজ্ঞ এবং সক্রিয়। যে সামান্য যত ব্যাপক সে তত বেশি শক্তিশালী এবং তত বেশি জ্ঞানশালী। অস্তিসামান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক। ইহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময়। ইহাই ঈশ্বর। অন্যান্য সামান্য সকল ইহার অন্তর্ভূত; কিন্তু ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, ইহারই এক একটী প্রকার মাত্র। প্রকৃতি একটী নিরাকার সত্তা। ইহার উপর সামান্যের ছাপ পড়িয়াই হয় সৃষ্টি। ঈশ্বর এবং প্রকৃতি, ইহারা উভয়ই পারমার্থিক। আরিষ্টটলের মতও তাহাই। পার্থক্য এই যে, তাঁহার মতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ জাতি বা সামান্যের কোনো অস্তিত্ব নাই। অবশ্য জাতিই ব্যক্তির সার (Essence); কিন্তু ইহার অস্তিত্ব ব্যক্তিরই মধ্যে, ব্যক্তির বাহিরে নহে। ব্যক্তিনিরপেক্ষ-ভাবে ইহা একটা সামান্যের প্রত্যয় (Concept) মাত্র। প্লটিনাস্ বলেন, সামান্য এবং ব্যক্তি, ইহারা সকলই প্রকৃত সত্তা। ঈশ্বরের মধ্যে যেমন সামান্য সকল (Ideas of universals) ইহার প্রকার স্বরূপে বর্ত্তমান, তেমন সামান্যের মধ্যেও ব্যক্তিসকল (Ideas of individuals) ইহার প্রকার স্বরূপে বর্ত্তমান। আর এক কথা এই—এবং ইহা একটি বড় কথা,—প্রকৃতি পারমার্থিক তত্ত্ব নহে। প্রকৃতি এবং সামান্য ইহারা যাহা পারমার্থিক তাহারই দুইটা দিক (aspects) মাত্র। প্লটিনাসের পারমার্থিক সত্তা বা ঈশ্বর—ভারতীয় দার্শনিকদিগের ভাষায় ব্রহ্ম—এক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত

সত্তা। ইহাকে বুদ্ধি দ্বারাও ধরা যায় না, বাক্য দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। ইহা বাক্য মনের অতীত, সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অতীত। ইহার সম্বন্ধে কোনো বাক্য প্রয়োগ করা যায় না, করিলে ইহাকে খর্ব্ব করা হয়। এমন কি ইহা আছে এই কথাও বলিতে পারি না। ইহা অস্তি নাস্তির, সদসতের অতীত। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বলিতে যাহা বোঝায়, ইহা তাহাই। প্লটিনাসের ব্রহ্মের বর্ণনা পাঠ করিলে, স্বতঃই আমাদিগের উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাহার কথা মনে উদয় হয়। মনে হয় যেন কোন ভারতীয় ঋষিপ্রদত্ত ব্রহ্মের বর্ণনাই পাঠ করিতেছি।

এই চিৎঅচিৎ জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। ব্রহ্মে পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ ফিরিয়া আসাই ইহার লক্ষ্য। এই কথা হইতে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্মেতি।" এই শ্রুতিটি স্বতই মনে পড়ে।

যেরূপ সূর্য্য হইতে কিরণ, অগ্নি হইতে উত্তাপ বিকীর্ণ হয়, তেমন অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব বিকীর্ণ হইয়াছে। ইহা একটী উপমা মাত্র। সকল বিষয় একরূপ হইবে না। কিরণ এবং উত্তাপ বিকীর্ণ হইয়া উৎসভ্রষ্ট হয়, বিশ্ব সেইরূপ উৎসভ্রষ্ট হয় না। ইহা ব্রহ্ম হইতে বিকীর্ণ হইয়াও ব্রহ্মেতে থাকে। এই বিকিরণ বা বিকাশ প্রবাহ অফুরন্ত; কিন্তু তথাপি ইহাতেই ব্রহ্ম পর্য্যবসিত নহেন। ইহাতে তাঁহার

কোনও ন্যূনতা ঘটে না। একটি তরল পদার্থপূর্ণ পাত্র হইতে এই পদার্থ অনবরত উথলিয়া পড়িয়াও পাত্রটি সদা পূর্ণ থাকিলে যেরূপ, সেইরূপ। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব-শিষ্যতে" বলিতে যাহা বোঝায়, ইহা তাহাই।

পারমার্থিক সত্তার প্রথম বিকাশ বুদ্ধি, বুদ্ধির বিকাশ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় (Intelligent and intelligible)—জীব ও জড়। ইহা পতনের ক্রম। সৃষ্টি আর পতন একার্থ বোধক। প্রতিনিবৃত্তির ক্রম হইয়াছে সংবেদন (sensation), জ্ঞান (reason) এবং অপরোক্ষানুভূতি (intuition)।

প্লেটোর ঈশ্বর অচিন্ত্য নহে। ইহা বুদ্ধিগম্য। প্লটিনাসের ঈশ্বর অচিন্ত্য—বুদ্ধির অগম্য। ইহাকে জানিবার একমাত্র উপায় অপরোক্ষানুভূতি (Intuition)। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায় কি? সকল প্রকার বিষয় হইতে মনকে গুটাইয়া আনিয়া দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। পারমার্থিক সত্তা বা ব্রহ্ম দ্বন্দ্বাতীত সুতরাং তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় ঐ অবস্থায় যাওয়া। ভারতীয় দার্শনিকের ভাষায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা বা সমাধিস্থ হওয়া। প্লটিনাস্ বলেন তাঁহার জীবনে চারবার ঐ অবস্থা লাভ হইয়াছিল এবং তাহাতে তিনি যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহার সহিত অন্য কোন প্রকার সুখেরই তুলনা মিলে না। আমাদিগের গীতার ভাষায় "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" বলিতে যাহা বোঝায়, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছিলেন।

প্লটিনাস্ বলেন, শিল্পী অন্বেষণ করে পারমার্থিক সত্তাকে সৌন্দর্য্যে, ভক্ত প্রেমে, জ্ঞানী ইহার নিজ আবাসস্থলে—গুণাতীত অবস্থায়। এই পথই সোজা। আমাদিগের দেশের সাধনার ভাষায় বলিলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে জানিবার জন্য কর্ম্ম এবং ভক্তির পথ অপেক্ষা জ্ঞানের পথ অপেক্ষাকৃত অধিক সরল এবং সুগম্য।

যদি পাঠকের, ভারতীয় বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শন পড়া থাকে তবে প্লটিনাসের দার্শনিক মতের মধ্যে এই তিন দার্শনিক মতের একটা সামঞ্জস্য দেখিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন। প্লটিনাসের দ্বন্দ্বাতীত অনির্ব্বচনীয় পারমার্থিক সত্তা এবং বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম একই বস্তু। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, বুদ্ধির বিকাশ; ইহাত সাংখ্য মতই। পারমার্থিক তত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা ধ্যান; ইহাত পাতঞ্জল মতই। প্লটিনাসের দার্শনিক মত, এই তিন দার্শনিক মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নহে। প্লটিনাস্ যখন আলেকজেণ্ড্রিয়ায় দর্শনের আলোচনা করিতেন তখন আলেকজেণ্ড্রিয়াতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে জ্ঞানীগণের সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। টলেমিদের গ্রন্থাগারে ৭,০০০০০ গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। এই ছাড়া ইহা একটী ঐতিহাসিক ঘটনা যে, প্লটিনাস্ প্রাচ্যদর্শন শিক্ষার জন্য, রোম সম্রাটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে পারস্যদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই সকল হইতে এবং তাঁহার দার্শনিক মতে, বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জলের সমন্বয়ের ভাব দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন

যে, প্লটিনাস্ তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠাতে, ঐ সকল দার্শনিক মতের দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তবে ঐরূপ মনে করা যে অযৌক্তিক হইবে তাহা বলা যাইতে পারে না।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, শঙ্কর, পারমেনাইডিস্ এবং শাস্ত্রতান্ত্রিক সৃষ্টিবাদীদিগকে অদ্বৈতবাদী মনে করিলে, তাঁহারা ছাড়া আর সকল অদ্বৈতবাদী দার্শনিকই, এক ভাবে না এক ভাবে পরিণামবাদী। যাহা এক অদ্বয় তত্ত্ব এবং যাহা সর্ব্বব্যাপী, অন্যনিরপেক্ষ (absolute), একরস বস্তু, তাহা বহু হয় কি প্রকারে? প্লটিনাস্ বলেন, ইহার উত্তর দেওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ইহা এক রহস্য। গুহ্যাৎ গুহ্যতম রহস্য।

অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে স্পিনোজা, রামানুজ, জিনোর মতে বিশ্বই ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম জগদন্তর্ভূত, জগদতীত নহেন (Immanent but not transcendent)। শাস্ত্রতান্ত্রিক সৃষ্টিবাদী (Scholastic Philosophers)দিগের মতে তিনি জগদতীত কিন্তু জগদন্তর্ভূত নহেন (Transcendent but not immanent)। অন্যান্য সকলের মতেই তিনি জগদতীত এবং জগদন্তর্ভূত উভয়ই (Both immanent and transcendent)। ধর্ম্মের দিক দিয়া বলিলে এই বলা যায় যে, যাঁহারা ব্রহ্মকে জগৎ স্বরূপ মনে করেন তাঁহারা সর্ব্বেশ্বর বাদী (pantheist) এবং যাঁহারা ইঁহাকে জগ-

দন্তর্ভূ্ত এবং জগদতীত মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বঈশ্বরান্তর্ভূত-বাদী (panentheist)।

শঙ্কর, পারমেনাইডিস্, হেগেল, বার্কলি, শেলিং, স্পিনোজা প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতে, পারমার্থিক তত্ত্ব এক অপৌরুষেয় সত্তা (নির্গুণ বা Impersonal being)। জিনো, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য্যের মতে ইহা জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা—ইহা একটি পুরুষ (personal being)।

অল্পকথায় আমরা এই বলিতে পারি যে শঙ্কর ব্যতীত আর সকল ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতেই পারমার্থিক তত্ত্ব এক সগুণ সত্তা বা personal being। শঙ্কর এবং ইয়ুরোপের সকল অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতেই ইহা একটি নির্গুণ সত্তা বা impersonal being।

জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদীদিগের মত প্রকাশ করিবার জন্য, ভাগবতে একটি সুন্দর শ্লোক রচিত হইয়াছে শ্লোকটি এই—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

পারমার্থিক তত্ত্বকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলেন যে, ইহা একটি অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সত্তা। ব্রহ্ম, ভগবান এবং পরমাত্মা শব্দ দ্বারা ইহাই লক্ষিত হয়। ইহার, নিষ্ক্রিয় বা নির্গুণ, সক্রিয় বা সগুণ, এবং ইহা সকল বস্তুর সার, এই তিনটি ভাব (aspects) আছে। এই তিনটি ভাব যথাক্রমে ব্রহ্ম, ভগবান এবং পরমাত্মা শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকটীতে, অদ্বয় পারমার্থিক সত্তা সগুণ না নির্গুণ, (Personal or Impersonal), জগদতীত না জগদন্তর্ভূত (Transcendent or immanent), এই সকল বিষয়ে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহার একটি সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুসত্তাবাদ (Pluralism)।

যে দার্শনিক মতে, পারমার্থিক তত্ত্ব সংখ্যায় একাধিক, তাহাকে বলা যাইতে পারে, বহুসত্তাবাদ (Pluralism)।

বহুসত্তাবাদ দুই প্রকার। এক প্রকার বহুসত্তাবাদ বলে, পারমার্থিক তত্ত্ব চিৎ এবং অচিৎ এই দুই শ্রেণীর বহুসত্তা। ইহা দুই শ্রেণীর বহুসত্তাবাদ (dualistic pluralism)। সাধারণতঃ ইহাকে বলা হয় দ্বৈতবাদ (dualism)। দ্বিতীয় প্রকার বহুসত্তাবাদ বলে পারমার্থিক তত্ত্ব এক শ্রেণীর বহুসত্তা। ইহা এক শ্রেণীর বহুসত্তাবাদ (monistic pluralism or pluralistic monism)। সাধারণতঃ বহুসত্তাবাদ বা pluralism বলিতে ইহাই লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদ বা dualismও দুইপ্রকার। এক প্রকার দ্বৈতবাদ বলে পারমার্থিক অচিৎ সত্তা, সংখ্যায় এক এবং ইহাই প্রকৃতি (nature); কিন্তু, চিৎ সত্তা সংখ্যায় অনেক এবং ইহারাই পুরুষ বা আত্মা। এই প্রকার দ্বৈতবাদকে ভারতীয় দার্শনিক

ভাষায় বলে প্রকৃতি-পুরুষবাদ। দ্বিতীয় প্রকার দ্বৈতবাদ অনুসারে, চিৎ এবং অচিৎ, উভয় প্রকার পারমার্থিক সত্তাই অসংখ্য—অসংখ্য পরমাণু এবং অসংখ্য পুরুষ।

দ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে প্রাচীন যুগের গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, আরিষ্টটল্, ভারতীয় দার্শনিক কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম এবং কণাদ, এবং বর্ত্তমান যুগের ইয়ুরোপীয় দার্শনিক ডেকার্ট ও ভারতীয় দার্শনিক মাধ্বের নাম, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সকল দ্বৈতবাদীর মতেই, চিৎ এবং অচিৎ, উভয়ই পারমার্থিক। সকলের মতেই চিৎবর্গ অসংখ্য আত্মা বা পুরুষ। কপিল ব্যতীত আর সকল দ্বৈতবাদীর মতেই পুরুষ সকলের মধ্যে এক বিশেষ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং জগৎ ব্যাপারের নিয়ামক এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর এবং জীবাত্মা সকলের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনো পার্থক্য নাই। যাহা কিছু পার্থক্য, তাহা কেবল জ্ঞান এবং শক্তির পরিমাণে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান। জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান।

কপিলের মতেও চিৎবর্গ অসংখ্য পুরুষ বা আত্মা। পুরুষ সকলের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগৎব্যাপারের নিয়ামক, এমন যে কোনও বিশেষ পুরুষ আছেন তাহা তিনি স্বীকার করেন না।

গৌতম এবং কণাদ ব্যতীত আর সকল দ্বৈতবাদীই অচিৎ-বর্গের পশ্চাতে যে একটি একত্ব রহিয়াছে তাহা স্বীকার করেন। এই একত্ব হইয়াছে প্রকৃতি বা nature। ইহাতে

বিকার বা পরিণাম আছে এবং ইহাই সৃষ্টি বৈচিত্রের কারণ। গৌতম এবং কণাদ, এই প্রকার কোনও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ এই চারি শ্রেণীর পরমাণু এবং ব্যোম বা আকাশ, ইহারা পরমার্থিক। ইহাদিগের পরিণাম নাই, পরমাণু সকলের স্থানচ্যুতি এবং নানা ভাবে মিশ্রণ আছে এবং ইহাই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ।

ডেকার্টের প্রসিদ্ধ তিনটি স্বতঃসিদ্ধ হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে তাঁহার মতে, ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ—অর্থাৎ জড় জগতের মূল উপাদান, ইহারা সকলই পারমার্থিক। তবে জড় জগতের মূল উপাদান পরমাণু না প্রকৃতি ইহা তাঁহার লিখা হইতে নিশ্চয়রূপ বলা যাইতে পারে না। তিনি পারমার্থিক সত্তা দ্রব্যের যে লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা হইতে, তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন না অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়রূপ বলা কঠিন। তাঁহার দার্শনিক মত প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, ঈশ্বর এক সর্ব্বনিরপেক্ষ দ্রব্য। জ্ঞান ও বিস্তার (thought and extension) অর্থাৎ জীব ও জড়, ইহারাও দ্রব্য, কিন্তু, ইহারা পরস্পর এবং অন্য নিরপেক্ষ হইলেও ঈশ্বর নিরপেক্ষ নহে। দ্রব্যের লক্ষণে, তিনি বলিলেন, যাহা সর্ব্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ, যাহার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনও সত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না, তাহাই দ্রব্য। সুতরাং দ্রব্য পারমার্থিক। যদি তাহাই হয়, তবে যাহা ঈশ্বর সাপেক্ষ তাহাকে দ্রব্য বলা যায় কিরূপে? নিরপেক্ষতা

যদি পারমার্থিকত্বের মাপকাঠি হয়, তবে, জ্ঞান এবং বিস্তার অর্থাৎ জীব ও জড়কে পারমার্থিক বলা যাইতে পারে না। আর এক কথা এই, জ্ঞান ও বিস্তার ঈশ্বর নিরপেক্ষ নহে, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, ঈশ্বর ইহাদিগের আশ্রয়, তবে ত ইহারা ঈশ্বরের গুণ বা শক্তিই হইল। স্পিনোজার মত যদি, ডেকার্টের মতের স্পষ্টতররূপ হয় তবে ত ডেকার্ট অদ্বৈত দ্রব্যবাদীই হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা হইলেও ডেকার্ট যে ভাবে, তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ তিনটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি যে ঈশ্বরের সগুণত্বে (personality তে) এবং দ্বৈত মতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা স্বতঃই মনে হয়। দ্রব্যকে, নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা, তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত ধর্ম্ম মতের যতটা সম্ভব, সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টার ফল মাত্র। কিন্তু ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দ্রব্যের লক্ষণে ইহাকে সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া, পরে ইহাকে নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করার মধ্যে যে একটা পরিষ্কার অযৌক্তিকতা রহিয়াছে, খ্রীষ্টিয়ান ডেকার্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া দার্শনিক ডেকার্ট তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

প্লেটো এবং কপিলের দার্শনিক মতের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার কয়েকটি বিষয় আছে। প্লেটোর মতে জাতি বা সামান্যের ভাব সকল (Ideas of universals) বাস্তব সত্তা; ইহারা সজ্ঞ এবং সক্রিয়। যে সামান্য যত ব্যাপক সে তত

শক্তিশালী। অস্তি-সামান্য বা অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-শালী। ইহাই ঈশ্বর। অন্যান্য সামান্য সকলের পৃথক অস্তিত্ব থাকিলেও ইহারা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, ইহারা ঈশ্বরেরই অন্তর্ভূত এবং ইহারই এক একটি প্রকার বা mode মাত্র। প্লেটো, এই সকল সামান্য ছাড়া এক নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিরও পারমার্থিকতা স্বীকার করেন। সামান্য সকল সজ্ঞ এবং সক্রিয়; প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় এবং নিরাকার। প্রকৃতির উপর সামান্যের ছাপ পড়িয়াই হয় সৃষ্টি। প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই, এই ছাপের ফল। ইহার দেহের উপাদান প্রকৃতি; জ্ঞান এবং আকারের উপাদান জাতি বা সামান্য। প্রকৃতিতে সামান্যের ছাপ পড়াই বন্ধন; ইহা ছাড়ানই মুক্তি। জ্ঞান (reason) অর্থাৎ আত্মানাত্মা বিচার বুদ্ধিই মুক্তি লাভের উপায়।

কপিলের মতে অসংখ্য পুরুষ এবং প্রকৃতি ইহারা সকলেই পারমার্থিক। পুরুষ সকল নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী মাত্র। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। আমাদিগের অন্তর এবং বহিরিন্দ্রিয়যুক্ত জড়দেহ প্রকৃতিরই কার্য্য—ইহারই বিকার, এক একটি পুরুষের জন্য এক একটি নির্ম্মিত। পুরুষ স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায়। ইহাতে দেহের প্রতিবিম্ব পড়িলেই, পুরুষ, এই প্রতিবিম্বিত দেহকেই "আমি" মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। ইহাই ইহার বন্ধন। বিবেকের সাহায্যে, এই ভ্রম দূর হইলেই হয় মুক্তি এবং দেহেরও হয় অবসান বা প্রকৃতিতে লয়।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে, দুই বিপরীত দিক হইতে কপিল এবং প্লেটোর মতের মধ্যে যে কি সাদৃশ্য আছে,

তাহা স্বতঃই পাঠকের চক্ষে পতিত হইবে। প্লেটোর সামান্য সকলকে যদি আমরা পুরুষ আখ্যা দেই, তবে আমরা এই বলিতে পারি যে, কপিলের মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা ; প্লেটোর মতে, পুরুষ সক্রিয় (active), প্রকৃতি একটি নিষ্ক্রিয় (passive) সত্তা। কপিলের মতে, পুরুষে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব পড়া পুরুষের বন্ধন ; প্লেটোর মতে, প্রকৃতিতে পুরুষের ছাপ পড়া পুরুষের বন্ধন। উভয়ের মতেই, আত্মানাত্মা জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

প্লেটোর ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে প্লেটোর প্রকৃতি একটি বাস্তব পারমার্থিক তত্ত্ব নহে। ইহা একটা অভাবাত্মক সত্তা—একটা অবস্থা (condition) যাহা স্বষ্টির জন্য প্রয়োজন। যাহা আছেও বলিতে পারি না নাইও বলিতে পারি না। ভারতীয় চরম অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদিগের কল্পিত অবিদ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, ইহা সেইরূপই একটা বস্তু। আমার মনে হয় প্লেটোর মত স্পষ্ট দ্বৈতবাদ। তাঁহার প্রকৃতি বা nature বাস্তব সত্তা। ইহা নিরাকার বটে, কিন্তু ইহাই দেহের অর্থাৎ সাকার বস্তুর উপাদান কারণ। সুতরাং ইহাকে একটা অভাবাত্মক সত্তা বা অবস্থা বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক কথা।

প্লেটোর দার্শনিক মতই আরিষ্টটলের দার্শনিক মতের ভিত্তি। সুতরাং তাঁহার দার্শনিক মতও অনেকটা, প্লেটোর দার্শনিক মতের ন্যায়। পার্থক্যও কিছু যে না আছে তাহা নহে। প্লেটোর মতে জাতি বা সামান্য সকল (Ideas of univer-

sals) বাস্তব সত্তা, ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবেই ইহাদিগের অস্তিত্ব আছে। আরিষ্টটল্ বলেন, জাতি ব্যক্তির সার (essence) ইহা সত্য ; কিন্তু জাতির অস্তিত্ব ব্যক্তি নিরপেক্ষ নহে, ব্যক্তিরই মধ্যে। ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবে ইহা একটা সামান্যের প্রত্যয় বা concept ব্যতীত আর কিছু নহে। প্লেটোর মত আগে জাতি পরে ব্যক্তি (Universalia ante res) আরিষ্টটলের মতে ব্যক্তির মধ্যেই জাতি (Uuniversalia in rebus) ব্যক্তি নিরপেক্ষ নহে।

প্লেটোর মত যেরূপ আরিষ্টটলের মতের ভিত্তি, তেমন কপিলের মতও পতঞ্জলির মতের ভিত্তি। তাঁহাদিগের মধ্যেও পার্থক্য কেবল একটি বিষয়ে, পতঞ্জলি পুরুষ বা আত্মা সকলের মধ্যে এক বিশেষ পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান জগৎব্যাপারের নিয়ন্তা—ঈশ্বর। কপিল তেমন কোনও বিশেষ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এইজন্য কপিলের সাংখ্য মতকে বলা হয় নিরীশ্বর সাংখ্য মত এবং পতঞ্জলির মতকে বলা হয় সেশ্বর সাংখ্য মত।

পতঞ্জলির দ্বৈতবাদের সহিত মাধ্বের দ্বৈতবাদের কোনও পার্থক্য নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, মাধ্বের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের ব্যাখ্যা, পতঞ্জলির দার্শনিক মতানুযায়ী ব্যাখ্যা বতীত আর কিছু নহে।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, অদ্বৈতবাদে অদ্বৈতবাদে যত রকম পার্থক্য আছে, দ্বৈতবাদে দ্বৈতবাদে তত রকম পার্থক্য নাই। সকল দ্বৈত-

বাদীর মতেই আত্মাসকল পারমার্থিক। কপিল ব্যতীত সকলের মতেই এই আত্মা সকলের মধ্যে এক বিশেষ আত্মা আছেন যিনি ঈশ্বর। গৌতম এবং কণাদ ব্যতীত আর সকলের মতেই অচিৎ বর্গের পশ্চাতে একটি একত্ব রহিয়াছে যাহা প্রকৃতি।

বহুসত্তাবাদ :

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যান্ট তাহার রচিত Critique of Practical Reason গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরও আছে জীবও আছে এবং আমাদিগের মনের বাহিরে এক জগৎও আছে। এই বাহিরের জগৎ আছে ইহা সত্য কিন্তু ইহার বিষয় আমরা, ইহা আছে এই ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। ইহা স্বরূপতঃ (in itself) কি, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। আমরা যে, বাহ্যজগতের উপলব্ধি করি, উহার অস্তিত্ব আমাদের আত্মা (জ্ঞাতা) এবং বাহিরের এই অজ্ঞেয় বস্তু এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। ইহা বাহিরের জগতের একটি প্রতীক (symbol) মাত্র। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এই কথা বলা যাইতে পারে না।

যদি এই পারমার্থিক জগতের স্বরূপ জানিবার আমাদিগের কোনও উপায়ই না থাকে, তবে ইহাকে চিৎও বলিতে পারি না অচিৎও বলিতে পারি না। সুতরাং এই বিষয়ে ক্যান্ট ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। তাঁহাকে চিৎবাদী (idealist)ও বলিতে পারি না ; চিৎ-অচিৎবাদী (realist)ও

বলিতে পারি না। তাহা হইলেও সাধারণতঃ তাহাকে চিৎবাদী (idealist)ই মনে করা হইয়া থাকে। এমন কি তাঁহাকে নব্যচিৎবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে জ্ঞানতান্ত্রিক ফিস্‌টে, শেলিং এবং হেগেল্ তাঁহারা প্রত্যেকেই ক্যাণ্টের দর্শনেই তাঁহাদিগের নিজ নিজ মতের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। যদি ফিস্‌টের বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদ (subjectivism) এবং হেগেলের জ্ঞান তান্ত্রিকতা (idealism) তাঁহার মতেরই পূর্ণতর রূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে অন্ততঃ তাঁহাদিগের মতে, তিনি যে চিৎবাদী (idealist) ছিলেন, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি কেহ মনে করেন যে, ক্যান্‌ট আমাদিগের মনের বাহিরে যে জগতের কথা বলিয়াছেন তাহা স্বরূপতঃ (in itself) কি, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য হইলেও তিনি নিজে ইহাকে এক বস্তুময় জগৎ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, তবে তিনি তাঁহাকে বলিতে পারেন বস্তু-বাস্তববাদী (realist)। যদি কেহ মনে করেন যে, হেগেলের দার্শনিক মতই তাঁহার মতের প্রকৃত রূপ, তবে তিনি তাঁহাকে বলিতে পারেন ভাব-বাস্তববাদী (idealistic realist or realistic idealist)। আর যদি কেহ মনে করেন ফিস্‌টের দার্শনিক মতই তাঁহার মতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা, তবে তিনি, তাঁহাকে বলিতে পারেন বিষয়ি বিজ্ঞানবাদী (subjectivist)। ক্যান্‌টকে বস্তু-বাস্তববাদীই বলি, বা ভাব-বাস্তববাদীই বলি, বা বিষয়ি-বিজ্ঞান-বাদীই বলি, একটি কথা নির্ব্বিবাদ সত্য এবং ইহা হইয়াছে এই

যে, তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। ঈশ্বর এবং জীবাত্মা যে পারমার্থিক সত্তা, ইহা তাহার স্পষ্ট উক্তি। সুতরাং তিনি ছিলেন বহুসত্তাবাদী। আমরাও তাঁহাকে বহুসত্তাবাদী দার্শনিকের শ্রেণীর অন্তর্ভূর্তই দেখাইলাম।

ক্যান্টকে বহুসত্তাবাদী মনে করিলে, তিনি ছাড়া অন্যান্য বহুসত্তাবাদীদিগের মধ্যে জড়তান্ত্রিক দার্শনিক হিউম, মিল, বেইন এবং চরম বিষয়ি বিজ্ঞানবাদী ফিস্‌টে এবং মনেড্‌বাদী লাইব্‌নিটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জড়তান্ত্রিক বহু সত্তাবাদীরা পরমাণুবাদী। পরমাণু সকল তাহাদিগের অন্ত-র্নিহিত অন্ধশক্তি দ্বারা আকস্মিকভাবেই নানাভাবে সংযুক্ত বা মিশ্রিত হইয়া এই জগৎ রচনা করিয়াছে। চৈতন্য এই সংযোগ বা মিশ্রণেরই কার্য্য। আমাদিগের আত্মা একটা চৈতন্য-প্রবাহ মাত্র। ইহার কোনও পারমার্থিকতা নাই। যখন একটিও পরমাণু থাকিবে না, তখন একটিও আত্মা থাকিবে না।

এই মতের বিপরীত বহুসত্তাবাদ হইল চরম বিষয়ি বিজ্ঞান-বাদ (solipsism) ইহাতে বলা হয় আমাদিগের মনের বাহিরে কোনও জগৎ নাই। আমরা বাহিরে যে জগৎ দেখি ইহা আমাদিগের নিজেরই সৃষ্টি, ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে। যখন একটি আত্মাও থাকিবে না তখন জগৎ বলিয়াও কিছু থাকিবে না।

পরমাণুবাদীরা বলেন অবিভাজ্য জড়কণা সকলই পার-মার্থিক তত্ত্ব। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে,

পরমাণুসকল প্রকৃতপক্ষে আয়তনবিশিষ্ট অবিভাজ্য সত্তা নহে, ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি বা কয়েকটি শক্তিকণা-সমষ্টি মাত্র। সুতরাং পরমাণুবাদীরা এখন বলিতে পারে শক্তিকণাসকলই পারমার্থিক তত্ত্ব। চরম বিষয়িবিজ্ঞানবাদীরা বলেন যাহারা পারমার্থিক তাহারা শক্তিকণা নহে, তাহারা জ্ঞানকণা।

এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায় লাইব্‌নিটের মনেড্‌বাদে (Monadism এ)। লাইব্‌নিট্‌ বলেন, পারমার্থিক সত্তাসকল শক্তিকণা বটে, কিন্তু তাহাদিগের অল্পবিস্তর জ্ঞানও আছে; শক্তি এবং জ্ঞান ইহাদিগের দুইটি দিক বা aspects মাত্র। ইহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানও নহে বিশুদ্ধ শক্তিও নহে। ইহাদিগকে সজ্ঞা শক্তি বা সশক্তিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র (autonomous), দ্বারহীন গৃহের ন্যায়, বাহির হইতেও কিছু ভিতরে আসিতে পারে না এবং ভিতর হইতেও কিছু বাহিরে যাইতে পারে না। তথাপি ইহাদিগের স্বভাবই এইরূপ যে, ইহারা স্বেচ্ছাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকিতে পারে। কতকগুলি মনেড্‌ স্বেচ্ছায়ই, কোনও একটি বিশেষ মনেডের অধীন হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকিতে পারে। যে স্থলে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা আছে সেই স্থলে জীবত্ব এবং যে স্থলে তাহা নাই সেই স্থলেই জড়ত্ব। আমাদিগের দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক একটি মনেড্‌ আছে যাহার অধীন হইয়া অন্য মনেড্‌ সকল চলে এবং এই সকল মনেডের উপরও একটি মনেড্‌ আছে যাহা আমাদিগের আত্মা।

প্রত্যেক মনেডের মধ্যেই উন্নতির বীজ আছে এবং প্রত্যেকেই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিয়া মানুষের আত্মা হইতে পারে। প্রত্যেক জীবেরই আত্মা স্থানীয় একটি মনেড্ আছে। মনুষ্যের আত্মায় এবং ইতর জীবের আত্মায় পার্থক্য এই যে, ইতর জীবের আত্মায় জ্ঞান (perception) থাকিলেও "আমি জ্ঞাতা" এই জ্ঞান (aperception) নাই; কিন্তু মনুষ্যের আত্মা স্থানীয় মনেডের জ্ঞান (perception)ও আছে এবং "আমি জ্ঞাতা" এই অনুভূতি (aperception)ও আছে।

জগতের সকল মনেডের উপর এক মনেড্ আছেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। মনেড্ সকল দ্বারহীন গৃহের ন্যায় হইলেও তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি দর্পণের ন্যায়। যেটির মধ্যে জগৎ যতটুকু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইটির জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ততটুকুই। মানুষের আত্মা মনেডে এই প্রতিবিম্ব যেরূপ স্পষ্ট সেইরূপ অন্য কোনও মনেডে নহে।

উপরে মনেড্ সম্বন্ধে যাহা বলা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকের মনে লাইব্নিটের দার্শনিক মত সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, তাঁহার মতে সকল মনেডই পারমার্থিক এবং অনাদি। ঈশ্বর মনেড্ও একটি মনেড্ বিশেষ মাত্র, অন্যান্য মনেডের সঙ্গে ইহার পার্থক্য স্বরূপগত নহে, জ্ঞানের এবং শক্তির পরিমাণগত মাত্র। ঈশ্বর মনেড্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান, অন্যান্য মনেড্ অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান। মনেড্ সকল স্বতন্ত্র এবং পারমার্থিক, সুতরাং ইহাদিগের ইচ্ছার

স্বাধীনতা আছে। আর এক কথা এই যে, ইহারা দ্বারহীন গৃহের ন্যায়, বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগের জন্য প্রত্যাদেশ (Revelation)ও সম্ভবপর নহে।

বাস্তবিক পক্ষে দার্শনিক লাইব্‌নিটের মত ইহাই। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতে (dogmaয়) বিশ্বাসী লাইব্‌নিটের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং যুক্তিবিচ্যুত হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে, ঈশ্বর মনেড্ অন্য মনেডের সৃষ্টিকর্ত্তা—অবস্তু হইতেই 'Exnihilo' সৃষ্টিকর্ত্তা; এবং মনেড্ সকল দ্বারহীন হইলেও প্রত্যাদেশ পাইতে পারে। যেমন সুস্পষ্ট দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিক ডেকার্ট প্রত্যাদেশে (Revelation এ) বিশ্বাসী ডেকার্টের প্ররোচনায়, তাঁহার দ্রব্যকে সর্ব্বনিরপেক্ষ দ্রব্য এবং ঈশ্বর সাপেক্ষ দ্রব্য এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন. তেমন সুস্পষ্ট বহুসত্তাবাদী অর্থাৎ মনেডের পারমার্থিকতায় বিশ্বাসী দার্শনিক লাইব্‌নিটও খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী লাইব্‌নিটের প্ররোচনায় তাঁহার মনেড্ সকলকে সৃষ্ট মনেড্ এবং অসৃষ্ট মনেড্ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহা দ্বারা সৃষ্টিবাদ সমর্থিত হইল বটে, কিন্তু মনেড্ বাদ আর মনেড্ বাদ রহিল না।

বাইবেলের ধর্ম্মমতের (dogma) সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টায় গণিতজ্ঞ দার্শনিক ডেকার্ট এবং লাইব্‌নিট, যে তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রতান্ত্রিক দার্শনিক (scholastic philoso-

pher) গণ হইতে অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন তাহা বলা যাইতে পারে না।

সে যাহাই হউক দার্শনিক লাইব্‌নিটের মনেড্‌ বাদের মধ্যে একটি পারমার্থিক সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইহা হইল এই যে, আয়তনবিশিষ্ট (Extended) কোনোও পারমার্থিক বস্তু নাই। যাহাদিগকে আমরা আয়তনবিশিষ্ট অবিভাজ্য পরমাণু বলি ইহারা শক্তিকণা ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহারা নিছক শক্তিকণাও নহে, ইহাদিগের অল্পবিস্তর জ্ঞানও আছে অর্থাৎ জ্ঞান এবং শক্তি ইহাদিগের তুইটা দিক মাত্র। ইহাদিগকে সশক্তিক জ্ঞান (active thought) ও বলিতে পারি অথবা সজ্ঞা শক্তি (thinking activity) ও বলিতে পারি।

উপরে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মত সকলের একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া হইল। বিজ্ঞান এবং দর্শনের মধ্যে কি সম্বন্ধ, প্রথম প্রকরণে, সেই বিষয়ে তুই একটি কথা বলা হইয়াছে। এখন আমরা এই বিষয়ে আরও তুই একটি কথা বলিতে পারি।

আমরা দেখাইয়াছি যে, দর্শন এবং বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য হইয়াছে জগৎ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা।

দর্শন চায় প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ ভাবে কেবল ধ্যানের সাহায্যে এক বা একাধিক সত্তাকে আদি কারণ কল্পনা করিয়া, ইহার বা ইহাদিগের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপারের সামঞ্জস্য দেখাইতে। বিজ্ঞান চায় পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ

লব্ধ সত্য হইতে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে। দর্শনের গতি অবরোহ, কারণ হইতে কার্য্যের দিকে (apriori); বিজ্ঞানের গতি আরোহণ, কার্য্য হইতে কারণের দিকে (aposteriori)। এখন দেখা যাউক আরোহী বিজ্ঞানের সহিত অবরোহী দর্শনের কোনো স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে কিনা। অর্থাৎ এমন কোনও সত্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির হইয়াছে কিনা, যাহা বৈজ্ঞানিক আরোহীর এবং দার্শনিক অবরোহীর মিলন স্থান।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে যে পরমাণুসকল আয়তন বিশিষ্ট অবিভাজ্য সূক্ষ্ম জড় কণা নহে। ইহারা প্রত্যেকেই কয়েকটী শক্তি কণার সমষ্টি। ইহারা আয়তন বিশিষ্টও নহে, পারমার্থিকও নহে। কেবল তাহাই নয়, বিজ্ঞান ইহাও দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে যে, ইহারা এক ইথার (ether) রূপ (ভারতীয় দার্শনিক ভাষায় আকাশ রূপ) সর্ব্বব্যাপী শক্তি সমুদ্রের মধ্য এক একটী শক্তি বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। যদি তাহাই হয়, তবে ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারাই স্থির হইল যে, সকল জড় বর্গের পশ্চাতে রহিয়াছে এক ক্রিয়াশীল সত্তা যাহাকে সাংখ্যেরা নাম দিয়াছেন প্রকৃতি, এবং তান্ত্রিকরা নাম দিয়াছেন শক্তি।

জগতে যে, অসংখ্য জীবাত্মা বা পুরুষ রহিয়াছে ইহা ত আমাদিগের অভিজ্ঞতারই বিষয়। এই পুরুষ সকলের পশ্চাতেও একটা একত্ব থাকিতে পারে। বিজ্ঞান ইহা এখনও দেখাইতে পারে নাই। ইহা এখনও কল্পনার ভূমিতেই

আছে। এখন নির্ব্বিরোধে স্বীকারের বিষয় হইল, এক সর্ব্বব্যাপী শক্তি এবং অসংখ্য জীবাত্মা বা পুরুষ। ইহা ত সাংখ্যেরই ভূমি। সাংখ্যেরা এখন বৈজ্ঞানিকদিগকে, গর্ব্বের সহিতই বলিতে পারে, আমরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম কেবল ধ্যানের সাহায্যে, তাহা তোমরা জানিলে, এতকাল পরে, তোমাদিগের গবেষণার অতি মাত্রায় মন্থরগতির সাহায্যে। বৈজ্ঞানিকও সগর্ব্বে বলিতে পারে, যাহা এতকাল ছিল তোমাদিগের নিকট কেবল কল্পনার বিষয়, তাহা আমরা দেখাইয়া দিলাম চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া। উভয়ের গর্ব্বই সার্থক, এবং দর্শন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যে, নিকট সম্বন্ধ তাহার সুস্পষ্ট আভাস।

আমরা বলিয়াছি এক একটী জড় পরমাণু এক অগাধ শক্তি সমুদ্রের মধ্যে এক একটী শক্তি বুদ্‌বুদ্। উপমান (analogy) প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, এক একটি জীবাত্মা বা পুরুষও এক অগাধ চৈতন্য-সমুদ্রের মধ্যে এক একটি চৈতন্য-বুদ্‌বুদ্ মাত্র। যদি কখনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহা দেখানো যাইতে পারে, তবে পারমার্থিক তত্ত্ব দাঁড়াইবে দুইটি সত্তায়—এক সর্ব্বব্যাপী শক্তিতে এবং এক সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যে। যদি এই দুই সত্তা একই সত্তার দুইটি দিক হয়, তবে ইহা হইবে এক সক্রিয় জ্ঞান অথবা এক সজ্ঞা শক্তি। সক্রিয় জ্ঞানে পাই হেগেল্‌কে ও সজ্ঞা শক্তিতে পাই শক্তিবাদী তান্ত্রিক দার্শনিককে। আর

যদি এই শক্তি এবং চৈতন্য একই দ্রব্যের দুইটি গুণ হয় তবে আসিয়া পঁহুছি আমরা স্পিনোজাতে।

লাইব্‌নিটের কল্পিত এক একটি মনেড্‌ও এক একটি শক্তি-কণা ; কিন্তু ইহাদিগের প্রত্যেকটির মধ্যে অল্প বিস্তর জ্ঞানও আছে ; সুতরাং ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে আমরা সক্রিয় সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যে এক একটি সক্রিয় জ্ঞানকণা বা সর্ব্বব্যাপী সজ্ঞাশক্তি সমুদ্রের মধ্যে এক একটি সজ্ঞা শক্তিকণা মনে করিতে পারি। আর যদি কখনও বিজ্ঞান দেখাইতে পারে যে, এই জ্ঞান এবং শক্তি ইহারা কার্য্য কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তবে পাইব আমরা হয় চরম চিৎবাদ (absolute idealism), নয় চরম শক্তিবাদ (absolute dynamism)। বিজ্ঞান কি ইহা দেখাইতে পারিবে ? কে বলিতে পারে পারিবে না ?

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে তত্ত্বের সংখ্যাভেদে দার্শনিক মতভেদ অল্প কথায় নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

মতসকল দুই প্রকার ঃ

(১) একসত্ত্বাবাদ (Singularism)।

(২) বহুসত্ত্বাবাদ (Pluralism)।

একসত্ত্বাবাদকে সাধারণতঃ বলা হয় অদ্বৈতবাদ (monism)।

অদ্বৈতবাদও দুই প্রকার ;

(১) অপরিণামবাদ বা অখণ্ডাদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ (absolute monism) বা মায়াবাদ (doctrine of illusion) (শঙ্কর পারমেনাইডিস্)।

(২) পরিণামবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (qualified monism)। (স্পিনোজা, শেলিং, হেগেল্, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য)।

বহুসত্তাবাদও দুই প্রকার ;

(১) দুই শ্রেণীর অসংখ্য সত্তাবাদ। সাধারণতঃ ইহাকে বলা হয় দ্বৈতবাদ (dualism or dualistic pluralism)

(২) এক শ্রেণীর অসংখ্য সত্তাবাদ (monistic pluralism) সাধারণতঃ ইহাকেই বলা হয় বহুসত্তাবাদ (pluralism)।

দ্বৈতবাদও দুই প্রকার ;

(১) এক অচিৎ এবং বহুপুরুষবাদ বা প্রকৃতি পুরুষবাদ (কপিল, প্লেটো, পতঞ্জলি)।

(২) বহু অচিৎ এবং বহু পুরুষবাদ বা পরমাণু ও পুরুষবাদ (কণাদ, গোতম, মাধ্ব)।

এক শ্রেণীর বহুসত্তাবাদ (Monistic pluralism) তিন প্রকার ;

(১) পরমাণুবাদ (atomism)—হিউম, বেইন, ডিমক্রিটাস, চার্ব্বাক প্রভৃতি।

(২) চরম বিষয়িবিজ্ঞানবাদ (solipsism)—ফিস্‌টে, বসুবন্ধু।

(৩) মনেড্‌বাদ (monadism)—লাইব্‌নিট্‌।

সত্তা এবং পরিণাম (Being and Becoming) ও জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় (Subject and Object).

প্রাচীন যুগের দার্শনিকদিগের নিকট সমস্যা ছিল, যাহা পারমার্থিক সত্তা (Being) সুতরাং একরসবস্তু, তাহা বিকৃত বা রূপান্তরে পরিণত (Becoming) হয় কি করিয়া ? অথচ এইরূপ পরিণতি স্বীকার না করিলে, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ-ব্যাপারও ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকদিগের নিকট সমস্যাটি দেখা দিল অন্যরূপে। ইহা হইল পারমার্থিক সত্তার জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব (Subjectivity and Objectivity) লইয়া। ইহা কি জ্ঞাতা না জ্ঞেয়, না উভয়ই, না কোনটাই নয় ? জ্ঞাতা জ্ঞেয় হয় কিরূপে এবং জ্ঞেয়ই বা জ্ঞাতা হয় কিরূপে ? অথচ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই উভয়ই যে আছে, ইহার ত আমাদিগের অভিজ্ঞতাই আছে।

প্রাচীন যুগের পারমেনাইডিস্‌ এই সমস্যার মীমাংসা করিলেন এই বলিয়া, যে, পারমার্থিক সত্তা যে এক অদ্বিতীয় অপরিণামী জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, ইহাই তত্ত্ব। আমরা যে, বৈচিত্র্যপ্রবাহ দেখিতে পাই, ইহা বিভ্রম দৃষ্টির ফল মাত্র। অপরিণাম (Being)ই তত্ত্ব। পরিণাম (Becoming) অতত্ত্ব।

আর একজন দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ এই মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, পরিণাম বা পরিবর্ত্তন প্রবাহই প্রকৃত তত্ত্ব। অপরিবর্ত্তনশীল, নিত্য একরূপ কোনও সত্তা নাই। এইরূপ পারমার্থিক সত্তার অস্তিত্ব কাল্পনিক। কোনও সত্তাই মুহূর্ত্তকালের অধিক একরূপ থাকে না। পরিণাম (Becoming)ই তত্ত্ব এবং অপরিণাম (Being) অতত্ত্ব।

এই দুই মতের মাঝামাঝি দুইটি মত আছে। এক মত বলে পারমার্থিক অদ্বয় তত্ত্বে রূপান্তরে পরিণতি বা বিকাশ আছে। এই বিকাশ আরম্ভ হইল কখন, এবং কি উদ্দেশ্যে? প্রাচীন যুগের দার্শনিক প্লটিনাস্ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, এক বহু হইল কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশ্যে, ইহা একটী রহস্য—মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। দার্শনিক হেগেল্ বলেন যে, পরিণাম প্রবাহ অনাদি। ইহাই মূর্ত্ত ঈশ্বর। জীব এবং জড়ের ভিতর দিয়াই তিনি যে জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা তাহা অনুভব করেন। এবং বিকাশের উদ্দেশ্যও তাহাই।

দ্বিতীয় মত বলে ঃ—জগতের কতকগুলি মূল উপাদান আছে যাহাদিগের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইহাদিগের বিনাশও নাই, বৃদ্ধিও নাই। কিন্তু অবিশ্রান্তই ইহাদিগের মিশ্রণ এবং স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে। ইহাদিগের মিশ্রণ এবং স্থানচ্যুতিই জগতের বৈচিত্র্য এবং পরিবর্ত্তন প্রবাহের কারণ। (এম্‌পিডকল্‌স্, এনাক্সাগোরাস্, ডাইওজিনিস্, ডিমক্রিটাস্)। কোন্ শক্তিদ্বারা এই পরিবর্ত্তন ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তরে সকলে একমত নহেন। এনাক্সাগোরাসের মতে, এই শক্তি

একটি জ্ঞানস্বরূপ শক্তি, যাহাদ্বারা জগৎ পরিচালিত হয় এবং যাহা ঈশ্বর। এম্পিডকল্সের মতে ইহা রাগ ও দ্বেষ (Love and hatred)। ডাইওজিনিস্ ও ডিমক্রিটাস্ প্রভৃতি জড়তান্ত্রিক পরমাণুবাদীদিগের মতে এই শক্তি, মৌলিক বস্তু সকলের অন্তর্নিহিত এক অন্ধ শক্তি।

পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব বিষয়ে, বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকদিগের চিন্তার ধারা কতকটা এইরূপ।

জড়তান্ত্রিক হিউম্, মিল্, বেইন্ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতে জ্ঞেয় বা অচিৎই পারমার্থিক তত্ত্ব, জ্ঞাতা বলিয়া কোনো স্থায়ী সত্তা নাই। আমরা যাহাকে আত্মা বা জ্ঞাতা বলি ইহা জড় মস্তিষ্কের কার্য্যস্বরূপ একটা চৈতন্য প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নহে।

দার্শনিক ফিস্‌টের (Fichte) মত ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, জ্ঞাতাই পারমার্থিক তত্ত্ব। জ্ঞাতা নিরপেক্ষ জ্ঞেয় বলিয়া কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই। জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাতার মনের মধ্যে এবং তাহারই সৃষ্টি। বিষয়িবিজ্ঞানবাদই প্রকৃত দর্শন।

আর যত দার্শনিক মত আছে, ইহারা সকলই এই দুই চরম মতের মাঝামাঝি। দার্শনিক স্পিনোজার মতে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—তাঁহার নিজের ভাষায় জ্ঞান এবং বিস্তার (thought and extension), ইহারা উভয়ই সত্য ; কিন্তু ইহারা সর্ব্বনিরপেক্ষ পারমার্থিক তত্ত্ব নহে। ইহারা এক অদ্বয় পারমার্থিক দ্রব্যের গুণ। জগতে এমন কিছু নাই, যাহা জ্ঞেয়ত্ব

বর্জ্জিত কেবল জ্ঞাতা বা জ্ঞাতৃত্ব বর্জ্জিত কেবল জ্ঞেয়। জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব—চৈতন্য এবং জড়ত্ব, একই সত্তার দুইটি দিক (aspect) মাত্র।

সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্ট বলেন, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা আমাদিগের মনের বাহিরে জ্ঞেয় বলিয়া কোনও পারমার্থিক বাস্তব সত্তা আছে কিনা ইহা নিরূপণ করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদিগের বিবেকের (moral facultyর) সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আত্মাও আছে এবং বাহিরের জগৎও আছে এবং ঈশ্বরও আছেন অর্থাৎ জ্ঞাতাও আছে, জ্ঞেয়ও আছে এবং ঈশ্বরও আছেন।

ফিস্‌টের মত সমালোচনা করিতে যাইয়া শেলিং বলেন যে ইহা সত্য যে জ্ঞাতা নিরপেক্ষ জ্ঞেয়, অর্থশূন্য ; কিন্তু ইহাও সত্য যে জ্ঞেয় নিরপেক্ষ জ্ঞাতাও অর্থশূন্য। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞাতাও আছে এবং জ্ঞেয়ও আছে। তবে, ইহারা কেহই পারমার্থিক নহে। পারমার্থিক যাহা তাহা ইহাদিগের উভয়েরই উৎস—এক অপৌরুষেয় (impersonal) ইচ্ছা। ইহারা উভয়ই, এই ইচ্ছারই বিকাশ (emanations)।

হেগেল্ তাঁহার বিতর্কের (dialectic) যুক্তি দ্বারা মনে করেন যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, ইহারা ইচ্ছার বিকাশ নহে। ইহারা হইতেছে, ইহাদিগের সমন্বয় হইতে পারে এইরূপ এক সর্ব্বনিরপেক্ষ জ্ঞানস্বরূপ সত্তার বিকাশ। এই জ্ঞানই পারমার্থিক তত্ত্ব। ইহা নির্গুণ (impersonal) কিন্তু নিষ্ক্রিয়

নহে। ইহা একটি বিকাশ প্রবাহ; জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—চিৎ এবং অচিৎ, ইহার বিকাশ।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের নিকটও প্রশ্নটি উঠিয়াছিল এই ভাবেই এবং উত্তর তাঁহারা দিয়াছেন এই ভাবেই।

শঙ্করের মতে পারমার্থিক সত্তা এক বিশুদ্ধ জ্ঞান। ইহাতে কোনও প্রকার বিকার বা পরিণাম সম্ভব নহে। বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা—বিভ্রম দৃষ্টির ফল—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়।

ক্ষণবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মতে অপরিণামী কোনও নিত্য সত্তা নাই। পরিণাম প্রবাহই তত্ত্ব। অপরিণামী স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব কাল্পনিক।

এই দুইটি মতের মাঝামাঝি দুইটি দার্শনিক মতের একটি হইল দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদিগের মত। তাঁহারা বলেন যে, পারমার্থিক তত্ত্ব, এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সত্তা বা জ্ঞাতা হইলেও ইহাতে পরিণাম বা বিকার আছে। ইহা ঘটে কি প্রকারে? কেই বা ইহা ঘটায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, পারমার্থিক সত্তা যেমন অনাদি, পরিণাম প্রবাহও তেমন অনাদি। বল্লভাচার্য্য ইহার উপরে একথাও বলেন যে, পারমার্থিক তত্ত্ব ব্রহ্ম, স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই এই পরিণামের সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় মতটি হইল দ্বৈতবাদীদিগের মত। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতি পুরুষবাদী তাঁহারা বলেন পুরুষ অপরিণামী কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী। ইহাতে বিকার আছে এবং ইহাই

সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। (কপিল, পতঞ্জলি, মাধ্ব)। এবং যাঁহারা পুরুষ পরমাণুবাদী তাঁহারা বলেন, আত্মা এবং জড়পরমাণু ইহারা উভয়ই পারমার্থিক এবং সংখ্যায় অসংখ্য। ইহারা স্বয়ং অপরিণামী কিন্তু ইহাদিগের সংস্থানের পরিবর্ত্তন আছে। এবং এই পরিবর্ত্তনই জগৎ ব্যাপারের বৈচিত্র্যের কারণ। (গৌতম, কণাদ)।

শঙ্করের মতে জ্ঞানই পারমার্থিক তত্ত্ব। জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় বলিয়া কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই। বৌদ্ধ যোগাচারী বসুবন্ধুর মতে জ্ঞাতা বা জীবাত্মা সকলই একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব। জ্ঞাতার মনের বাহিরে জ্ঞেয় বলিয়া কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতে, পারমার্থিক অদ্বয় তত্ত্বে স্বগত ভেদ আছে। সুতরাং ইহা একাধারে "জ্ঞাতা জ্ঞানং জ্ঞানগম্যম্" অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়।

দ্বৈতবাদীদিগের মতে আত্মা এবং জড় উভয়ই পারমার্থিক, সুতরাং, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই উভয়ও পারমার্থিক।

বিষয়িবিজ্ঞানবাদ (Subjectivism) ও বাস্তববাদ (Realism) !

কোনোও কোনো দার্শনিক মনে করেন আমাদিগের মনের বাহিরে জগৎ বলিয়া কোনোও বাস্তব সত্তা নাই। আমরা যে জগৎ দেখি, ইহার অস্তিত্ব জ্ঞাতা সাপেক্ষ। জ্ঞাতা থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না। ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে। যখন একটি মনও থাকিবে না, তখন কোনোও

জগৎও থাকিবে না। যে সকল দার্শনিক এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়, বিষয়িবিজ্ঞানবাদী (subjectivist)। তাঁহাদিগের মতের নাম বিষয়িবিজ্ঞানবাদ (subjectivism)। বিষয়িবিজ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা কেবল জীবাত্মাসকলকেই পারমার্থিক তত্ত্ব মনে করেন তাঁহাদিগকে বলা হয় চরম বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদী (solipsist), তাঁহাদিগের মতের নাম চরম বিষয়িবিজ্ঞানবাদ (solipsism)।

এই মতের বিপরীত মত বলে যে, এই দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে এক বাস্তব জগৎ আছে। ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরে। আমরা যে জগৎ অনুভব করি, ইহা বাহির জগতের একটি ছাপ বা প্রতিবিম্বমাত্র। প্রকৃত জগৎ আমা-দিগের মনের বাহিরে। যে সকল দার্শনিকের এই মত, তাহা-দিগকে বলা হয় বাস্তববাদী (realists)। তাহাদিগের মতের নাম বাস্তববাদ (realism)।

বাস্তববাদও দুই রকমের। এক রকমের বাস্তববাদ বলে, আমরা যে জগৎ দেখি ইহার উপাদান জড় এবং অপর রকমের বাস্তববাদ বলে যে, ইহার উপাদান জড় নহে, ইহার উপাদান জ্ঞান (idea) এবং যদিও ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরে, তথাপি ইহা সর্ব্বতোভাবে মন নিরপেক্ষ নহে। ইহার অস্তিত্ব ঈশ্বরের মনের মধ্যে। ঈশ্বরের মনের মধ্যে ইহা একটি ভাব-জগৎ। আমরা অসীম ঈশ্বরের সসীম অভিব্যক্তি বা বিকাশ। সুতরাং যাহা ঈশ্বরের মনে অসীমভাবে অভিব্যক্ত তাহা আমরা সসীমভাবে প্রত্যক্ষ করি।

প্রথম প্রকারের বাস্তববাদকেই সাধারণতঃ বাস্তববাদ বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বাস্তববাদের নাম ভাববাস্তববাদ (ideal realism)। এই উভয় মতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা প্রথম প্রকারের বাস্তববাদকে বস্তু-বাস্তববাদ (materialistic realism) বলিতে পারি। ভাব জগৎ, আমাদিগের মনের বাহিরে থাকায়, ইহা কেবল ভাবাত্মক হইলেও আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া, ভাব বাস্তববাদকে, বিষয়াত্মক ভাব বাস্তববাদ (objective idealism)ও বলা হইয়া থাকে। দার্শনিক হেগেল এবং বার্কলি ভাব বাস্তববাদী। তাঁহাদিগের কথা এই যে জ্ঞানস্বরূপ পারমার্থিক তত্ত্ব, জড় ও জীবজগতের বিকাশ দ্বারাই তিনি যে জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা, তাহা অনুভব করেন এবং বিকাশ বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাহাই।

বস্তুরূপেই হউক বা ভাবরূপেই হউক আমাদিগের মনের বাহিরে এক প্রকৃত জগৎ আছে। ইহা কেবল বিষয়িগত সত্তা নহে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলও জীবদেহের (organised bodyর) অংশসকলের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ। একটিতে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলে, অন্যান্যগুলির মধ্যেও একভাবে না একভাবে পরিবর্ত্তন ঘটে। এই অর্থেই বাস্তববাদীরা বলিয়া থাকেন যে, জগৎ একটি সঙ্ঘবদ্ধ বাস্তব সত্তাসমষ্টি (A system of reals)।

বাস্তববাদ এবং বিষয়ি-বিজ্ঞানবাদ এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি দার্শনিক মত আছে। দার্শনিক লক বলেন, জড় বস্তুর

দুই প্রকার গুণ আছে, মুখ্য এবং অমুখ্য। মুখ্যগুণ বস্তুগত এবং অমুখ্য গুণ বিষয়িগত। অভেদ্যতা এবং বিস্তার মুখ্যগুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি অমুখ্য গুণ। অভেদ্যতা এবং বিস্তার দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, আমাদিগের মনের বাহিরে এক বস্তুময় জগৎ আছে; কিন্তু রূপ, রস. গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়গত গুণ দ্বারা যে জগৎ প্রকাশিত হয়, ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে—বিষয়িগত; বিষয়ী থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না। অল্প কথায় ইহার অর্থ এই যে, অভেদ্যতা এবং বিস্তার বিশিষ্ট যে জগৎ ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরে; ইহাই বাস্তব জগৎ এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়িগত গুণ দ্বারা প্রকাশিত যে জগৎ তাহা অবাস্তব; ইহার অস্তিত্ব জ্ঞাতা সাপেক্ষ, জ্ঞাতা থাকিলে থাকে না থাকিলে থাকে না।

দার্শনিক ক্যাণ্ট তাঁহার প্রণীত Critique of Pure Reason গ্রন্থে বলেন যে,আমাদিগের যতপ্রকার প্রত্যয় আছে, ইহারা সকলই সংবেদন (sensation) মূলক। সংবেদন বা প্রত্যক্ষই, আমাদিগের জ্ঞানের উপাদান যোগায়। আমাদিগের জন্মগত, দেশ, কাল, দ্রব্য এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞানের সাহায্যে, আমাদিগের বুদ্ধি এই সকলকে সাজাইয়া গুছাইয়া আকার দেয় বটে, কিন্তু ইহার বেশি আর কিছু করিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের প্রত্যক্ষীকৃত যে জগৎ ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে। ইহার পশ্চাতে হয়ত বা কোনো বাস্তব জগৎ আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তির দ্বারা, ইহার স্বরূপ কি

এবং বিষয়িনিরপেক্ষভাবে ইহা আছে কিনা, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। Critique of Pure Reason এর লিখা দ্বারা বিচার করিলে, ক্যান্টকে বিষয়িবিজ্ঞানবাদী বলিলে, কথায় যে বিশেষ ভুল হইবে তাহা নহে। তাহা হইলেও ক্যাণ্ট প্রকৃতপক্ষে বিষয়িবিজ্ঞানবাদী ছিলেন না। তাঁহার রচিত Critique of Practical Reason গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা বাহিরের জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলেও আমাদিগের বিবেকের (moral facultyর) সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে আমাদিগের মনের বাহিরে এক জগৎ আছে, আমাদিগের আত্মাও আছে এবং ঈশ্বরও আছেন। কিন্তু জগৎ আছে কেবল এইমাত্রই বলিতে পারি : ইহা স্বরূপতঃ (in itself) কি, তাহা বলিতে পারি না।

তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, লকের ন্যায় ক্যাণ্টের মতেও রূপ, রস প্রভৃতি, ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত যে জগৎ ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে—জ্ঞাতা-সাপেক্ষ, বিষয়িগত। লক বলেন, অভেদ্যতা এবং বিস্তার যে জগতের সংবাদ দেয়, ইহা এক বাস্তব জগৎ ; ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরে। ক্যাণ্ট, অভেদ্যতা এবং বিস্তারকে বস্তুগত মুখ্য গুণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, আমাদিগের বিবেক (moral faculty) যে জগতের সংবাদ দেয় ইহার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের বাহিরে। সে যাহাই হউক, এই উভয় প্রসিদ্ধ দার্শনিককেই আমরা এক

অর্থে বিষয়িবিজ্ঞানবাদী এবং এক অর্থে বাস্তববাদী বলিতে পারি।

বাস্তববাদ (realism) কথাটির আরও একটি দার্শনিক অর্থ আছে। প্লেটো, কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে, প্রত্যেক জাতিবাচক নামের পশ্চাতে ভাব (idea) রূপ এক জাতি বা সামান্য আছে। ইহা কাল্পনিক সত্তা নহে: ইহা এক প্রকৃত সত্তা। ইহা সক্রিয় এবং সজ্ঞ। প্লেটোর মতে, এই ভাবরূপ সত্তা যে কেবল আছে তাহা নহে, পরন্তু ইহাই প্রকৃত সত্তা। এই ভাব জগতই প্রকৃত জগৎ। আমরা বাহিরে যে জগৎ দেখি, ইহা নিরাকার প্রকৃতির (nature) উপর ভাব জগতের একটা ছাপ মাত্র। প্লেটো এই ভাবসকলকে কখনো কখনো আকৃতি (form) এবং কখনো কখনো আদর্শ (arch type) নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল সত্তার অস্তিত্ব আমাদিগের মনের মধ্যে, এই জন্য ইহারা ভাব (idea); ইহারা প্রকৃতিকে আকৃতি দেয় বলিয়া জাগতিক বস্তুসকল আকৃতি বিশিষ্ট, এইজন্য ইহারা আকৃতি (form); ইহাদিগের আদর্শই জগতের সৃষ্টি, এইজন্য ইহারা আদর্শ। এইজন্য প্লেটোর দার্শনিক মতকে আদর্শ বাদও বলা হইয়া থাকে। জাতিবাচক নামের পশ্চাতে ভাব রূপে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ সজ্ঞ এবং সক্রিয় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকদিগকেও বাস্তববাদী (realist) বলা হইয়া থাকে। অন্য দুই শ্রেণীর বাস্তববাদ (materialistic realism and idealistic realism) হইতে এই বাস্তব বাদের

পার্থক্য দেখাইবার জন্য আমরা ইহাকে জাতিবাস্তববাদ (specific realism) আখ্যা দিতে পারি। অথবা প্লেটো এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা ইহাকে প্লেটনিক (Platonic) বাস্তব বাদও বলিতে পারি।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা অল্পকথায়, এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাস্তববাদ (realism) তিন প্রকার। ১ম, বস্তু বাস্তববাদ (materialistic realism)। মোটের উপর সকল জড় তান্ত্রিক এবং দ্বৈতবাদীগণ বস্তু বাস্তব বাদী। ২য়, ভাববাস্তববাদ (ideal realism, realistic idealism or objective idealism)। হেগেল, বার্কলি প্রভৃতি জ্ঞান তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ ভাব বাস্তববাদী। ৩য়, জাতিবাস্তব বাদ (specific or Platonic realism)। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, প্লটিনাস্, এবং ভারতীয় দার্শনিক কণাদ, জাতিবাস্তব বাদী।

জাতি বাস্তব বাদের বিপরীত মতের নাম, নামবাস্তব বাদ (nominalism)। এই মতে বলা হয় যে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ জাতি বলিয়া কোনও প্রকৃত সত্তা নাই। জাতিবাচক নামের পশ্চাতে ব্যক্তি ছাড়া কোনও বাস্তব সত্তা নাই। জাতিবাচক নাম, নাম ব্যতীত আর কিছু নহে।

জাতি বাস্তববাদ এবং নামবাস্তববাদ এই দুই মতের মাঝামাঝি আর এক মত আছে। ইহাকে বলা হয় সামান্য-প্রত্যয়বাদ (conceptualism)। এই মত বলে যে, যদিও ব্যক্তি নিরপেক্ষ জাতি বলিয়া কোনো সত্তার অস্তিত্ব নাই ইহা

সত্য, তথাপি আমরা মনে মনে জাতির একটা কল্পনা করিতে পারি এবং ইহার প্রকৃতিরও একটা ধারণা করিতে পারি। এই সামান্যের ধারণা সকলকে (general notions) বলা হয় সামান্যের প্রত্যয় (concepts)। চরম নামবাদীরা এই কথা অস্বীকার করেন। তাহারা বলেন, ব্যক্তি নিরপেক্ষ সামান্যের কোনও ভাবই আমাদিগের মনে উদয় হয় না। আমরা যখন মনুষ্যজাতির কথা ভাবি তখন মনুষ্য ব্যক্তির চেহারাই আমাদিগের মনে পড়ে এবং আমরা সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিয়া বলি যে আমরা মনুষ্যত্বের অর্থাৎ মানুষ জাতির ভাবই মানস পটে লক্ষ্য করিলাম।

সংক্ষেপে কথা দাঁড়াইল এই :—

জাতিবাস্তববাদ বলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামান্য, প্রকৃত সত্তা ; ইহা সজ্ঞ এবং সক্রিয়। সামান্যপ্রত্যয়বাদ বলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ জাতির ভাব আমরা মনে মনে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু ইহার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। নামবাদ বলে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ জাতি বলিয়া কোনো সত্তাত নাইই, ইহার কোনো ভাবও আমরা মনে আনিতে পারি না।

চতুর্থ প্রকরণ

দর্শন ও সৃষ্টি।

সৃষ্টি সম্বন্ধে দার্শনিক মত ঠিক বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য। সৃষ্টি দুই প্রকার হওয়ার সম্ভব। ১ম, যাহা কোনো আকারেই পূর্ব্বে ছিল না, তাহার উৎপত্তি—অর্থাৎ "কিছু না" হইতেই উৎপত্তি ; ২য়, যাহা পূর্ব্বে অপ্রকট বা অপ্রকাশ ছিল, তাহার বিকাশ বা অভিব্যক্তি। প্রথম প্রকারের সৃষ্টিকেই সাধারণতঃ সৃষ্টি (Creation) বলে। দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টির সাধারণ নাম বিকাশ (Evolution)। আমরা সৃষ্টি কথা দ্বারা প্রথম প্রকারের সৃষ্টিই বুঝিব, এবং বিকাশ বা অভিব্যক্তি কথা দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টি বুঝিব।

সৃষ্টি বা বিকাশের পশ্চাতে যদি কোনো সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি থাকে, তবে ইহাকে বলে উদ্দেশ্য-মূলক (Teleological) সৃষ্টি বা বিকাশ। এবং ইহা যদি একটি উদ্দেশ্য-বিহীন আকস্মিক ব্যাপার হয় তবে ইহাকে বলে আকস্মিক (Fortuitous) সৃষ্টি বা বিকাশ।

সৃষ্টিই হউক বা বিকাশই হউক, ইহারা উভয়েই কার্য্য, উভয়েরই আদি আছে। সকল বাস্তবিক কার্য্যেরই দুইটি কারণ থাকে ; একটি, যে উপাদানে বস্তুটি নির্ম্মিত সেই, উপাদান ; এবং দ্বিতীয়টি, যে শক্তি দ্বারা, উপাদান ঐ বস্তুর আকারে পরিণত হয় সেই শক্তি। প্রথমোক্তটিকে বলে

উপাদান কারণ (material cause) এবং শেষোক্তটিকে বলে নিমিত্ত কারণ (Efficient cause)।

এই জগৎ একটি কার্য্য। সুতরাং ইহারও নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ আছে। এমন হইতে পারে যে, নিমিত্ত কারণ কিছু না হইতেই উপাদান সৃষ্টি করিয়া, তদ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ, উভয়ই অনাদি। নিমিত্ত কারণ হাতে পাওয়া উপাদানের দ্বারাই জগৎ রচনা করিয়াছে—কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকার দ্বারা ঘট নির্ম্মান করে সেইরূপ। এরূপও হইতে পারে যে, নিমিত্ত কারণ, নিজেকেই উপাদান স্বরূপে ব্যবহার করিয়া, জগতাকারে প্রকাশ করিয়াছে—উর্ণনাভ যেরূপ জালবিস্তার করে সেইরূপ। আবার চতুর্থ এক প্রকার কল্পনাও হইতে পারে। ইহা এই যে, উপাদান ইহার অন্তর্নিহিত অন্ধশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া জগদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দার্শনিকদিগের মধ্যে সৃষ্টি বা বিকাশ সম্বন্ধে এই চার প্রকার মতই আছে। বলা বাহুল্য, যে প্রথম প্রকারের মত সৃষ্টিবাদ (Doctrine of creation)। ইহা ইয়ুরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিত দার্শনিকদিগের (Schoolmen) মত। সৃষ্টিবাদ অন্য কোনও শ্রেণীর দার্শনিক মতে দেখা যায় না। এমন কি, পূর্ণমাত্রায় শাস্ত্রমূলক বেদান্ত, দর্শনেও সৃষ্টিবাদের সমর্থন নাই। সৃষ্টি (creation) উদ্দেশ্য মূলক (Teleological)।

দ্বিতীয় প্রকার জগৎ রচনা, দ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মত। ইহা বিকাশ এবং উদ্দেশ্য মূলক (Evolutional and Teleological)।

তৃতীয় প্রকার জগৎ রচনা এক ঈশ্বরবাদী পণ্ডিত দার্শনিক (Schoolmen) ছাড়া, জ্ঞান-তান্ত্রিক এবং দ্রব্য-তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মত। ইহা বিকাশ এবং উদ্দেশ্য মূলক। (Evolutional and Teleological)।

চতুর্থ প্রকারের জগৎ রচনা, জড়তান্ত্রিক (materialistic) দার্শনিকদিগের মত। ইহা বিকাশ এবং আকস্মিক (Evolutional and Fortuitous)।

এখন দেখা যাউক, এই চার মতের, প্রত্যেকের পক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি কথা আছে।

প্রথমতঃ, জড়তান্ত্রিকতার (Materialistic doctrine-এর) কথাই ভাবা যাউক। এই মতে, আদি কারণ অসংখ্য পরমাণু, ইহারা ইহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা আকস্মিক ভাবেই পরিচালিত হয়। চৈতন্য ইহাদিগের কোনও এক বিশেষভাবে সংস্থানজন্য মস্তিষ্কের কার্য্য। চৈতন্য জড়েরই কার্য্য। জগৎ একটা আকস্মিক ব্যাপার। পূর্ব্বে পরমাণু সকল অনন্ত আকাশে ছড়াইয়া ছিল। তাহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুঞ্জীকৃত হয়। এই পুঞ্জসকলকে বলা হয় নীহারিকা (nebula)। এক একটি নিবিউলা ঘনীভূত হইয়া এক একটি সূর্য্যে পরিণত হয়। এই সূর্য্য সকল তাহাদিগের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে

থাকে। এইরূপ ঘুরিবার সময় তাহাদিগের অংশ কখনো কখনো ছিটকাইয়া যাইয়া তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। এই সকল ইহাদিগের গ্রহ (Planet)। আবার কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রহেরও অংশ ছিটকাইয়া যাইয়া ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। ইহারা উপগ্রহ। পৃথিবী আমাদিগের সূর্য্যের একটী গ্রহ ; চন্দ্র ইহার উপগ্রহ। এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য। পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়া জীবের বাসের উপযুক্ত হইলে, জড় পরমাণুই জীবরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জীব-জগতের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে মানুষ। মোটামুটিভাবে ইহাই দার্শনিক স্পেনসার প্রবর্ত্তিত যান্ত্রিক (mechanical) বিকাশবাদ।

জড়বাদীদিগের জগৎ-ব্যাপার ব্যাখায় একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, ইহাতে জড় হইতে জীবের উৎপত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অবশ্য জড়বাদীদিগের এই বিষয়ে নানারূপ কল্পনা আছে ইহা সত্য, কিন্তু ইহা-দিগের একটিও সন্তোষজনক নহে। একটি কল্পনা এই যে, সুদূর অতীতকালে পৃথিবীর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তখন জড় হইতেই জীব উৎপন্ন হইয়াছিল ; এখন আর সে অবস্থা নাই, তাই জড় হইতে জীবের বিকাশ বা উৎপত্তি দেখা যায় না। আর একটি কল্পনা এই যে, হয়ত বা উল্কাপিণ্ডসকলের মধ্য দিয়া অন্য গ্রহ হইতে জীব বীজ পৃথিবীতে আসিয়াছে। এই সকল কথার কোনো প্রমাণ নাই, এবং ইহাদিগের দ্বারা

জড় হইতে জীবের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না। অন্ততঃ সন্তোষজনকরূপে ত নয়ই। নির্জীব হইতে সজীবের উৎপত্তি (abiogenesis) কেহ কখনো দেখে নাই। যত নিম্নস্তরের জীবই হউক না কেন, জীব হইতেই জীবের জন্ম দেখা যায়। নির্জীব হইতে যে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে, এই মত (Doctrine of abiogenesis) কোনো প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; কিন্তু জীব হইতে যে জীবের উৎপত্তি হয়, এই মত (Theory of biogenesis) সকলের অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

জীবের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহা বাহির হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া ভিতর হইতেই বর্দ্ধিত হয় এবং পরে অন্য জীব উৎপন্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। আহার গ্রহণ, বৃদ্ধি, বংশধর উৎপাদন এবং মৃত্যু এই সকলই ইহার ধর্ম্ম। জড়েতে এই সকলের কিছুই লক্ষিত হয় না। জীবের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম অবস্থায় ইহাকে বলে প্রটোপ্লেজম্। ইহাও এই ধর্ম্ম বিশিষ্ট। অবশ্য কার্ব্বন, নাইট্রোজান, হাইড্রোজান, অক্সিজান প্রভৃতি জড় পরমাণু ইহার উপাদান। কিন্তু তাহা হইলেও এই সকলের সংশ্লেষণ দ্বারা কেহ আজ পর্য্যন্ত কোনো জীব বা জীবাণু উৎপন্ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং, স্বীকার করিতেই হইবে, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ইহার জড় উপাদান ব্যতীত আরও কিছু একটা আছে, এবং এই কিছু একটা আছে বলিয়াই জীব, জীব। এবং এই কিছু একটাই, জীব এবং জড় যন্ত্রের পার্থক্যের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য। জীব দেহ এবং

যন্ত্র উভয়ই এক বা একাধিক অংশ বা অঙ্গ সমষ্টি ; কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। যন্ত্রের অংশ সকল বাহিরের শক্তি দ্বারা সন্নিবিশিষ্ট হয় ; একটিকে বাহিরের শক্তি দ্বারা চালাইলে ইহার বেগ অন্য অঙ্গে সংক্রামিত হয় এবং যন্ত্রটি অন্ধভাবে যন্ত্রনির্ম্মাতার উদ্দেশ্য সাধন করে। কোনোও অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে ইহাকে বাহিরে আনিয়া মেরামত করিতে পারা যায়। জীব দেহের ধর্ম্ম অন্য রূপ। ইহা তাহার ভিতরের শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়, এই ভিতরের শক্তি আছে বলিয়াই ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসকল পরস্পরের সাহায্য করিয়া সমগ্র দেহের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, যতক্ষণ এই ভিতরের শক্তি বা জীবনীশক্তি থাকে ততক্ষণই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সকল তাহাদিগের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এবং দেহটিকেও রক্ষা করিতে পারে ; আবার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সকল যতক্ষণ কার্য্যক্ষম থাকে ততক্ষণই এই জীবনীশক্তিও থাকে। প্রত্যেক অঙ্গ সমগ্রকে জীবিত রাখিবার সাহায্য করে এবং সমগ্রের শক্তিই প্রত্যেক অঙ্গকে জীবিত রাখে। যন্ত্রের ন্যায় কোনোও অঙ্গ (organ)কে কাটিয়া আনিয়া বাহির হইতে ইহার মেরামত করা চলে না।

জড়তান্ত্রিক ক্রমবিকাশবাদীদিগের অগ্রণী ডার্‌বিন্‌কেও এই কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, যদি আমরা মনে করি, যে ঈশ্বর এই বিকাশ-প্রবাহের মধ্যে কয়েকটি মাত্র জীবাণু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন,

এবং ইহাদিগের ক্রমবিকাশ দ্বারা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ প্রকটিত হইয়াছে, তবে ইহা সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা মহতী কল্পনা হয়। অবশ্য ইহা একটা মহতী কল্পনা হইবে ঠিক, কিন্তু ইহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছু হইবে না। আর এক কথা এই, জড়তান্ত্রিকতার মধ্যে ঈশ্বর এবং আদি জীবাণু টানিয়া আনিলে, জড়তান্ত্রিকতা আর জড়-তান্ত্রিকতা থাকে না, ইহা চিৎ অচিৎ রূপ পারমার্থিক তত্ত্ববাদ অর্থাৎ দ্বৈতবাদ হইয়া দাঁড়ায়।

ডার্‌বিনের মতে, ক্রমবিকাশের প্রবাহে জীবের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে ইহা একটি আকস্মিক (accidental, fortuitous) ব্যাপার। কোনো জীবে আকস্মিক ভাবে কোনো একটি কার্য্যকরী অবয়বের সৃষ্টি হইলে ইহার সাহায্যে জীবটি জীবনসংগ্রামে টিকিয়া যায়, এবং উত্তরাধিকার নিয়মে নিম্নপুরুষে সংক্রামিত করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর জীবের সৃষ্টি করে। মনুষ্যত্ব এই ক্রমবিকাশের উন্নততম অবস্থা—অবশ্য আজ পর্য্যন্ত।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেমার্ক বলেন যে, নূতন অবয়ব লাভ করা আকস্মিক ব্যাপার নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ইহা সংঘটিত হয়, এবং উত্তর পুরুষে সংক্রামিত হয়। ডার্বিনের মতে, অনুকূলাবয়ব প্রকৃতির খেয়াল বশতঃ ঘটে, এবং এই জন্যই বলা হয়, ইহা প্রাকৃতিক মনোনয়ন (Natural selection)। লেমার্কের মতে ইহাতে প্রকৃতির কোনো কৃতিত্ব নাই ; জীবই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া ইহা লাভ করে।

জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক বিস্‌মেন্‌ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবদেহে ঘটে না। ইহার সৃষ্টি জীবের বীজাণুতে (Germ plasmএ)। বীজাণু বা Germ plasm বলিতে তিনি স্ত্রী ও পুং Germ cell সংযোগে যে জীব সৃষ্টি হয় তাহাই লক্ষ্য করেন। তাহার ভাষায় ইহা Fertilized egg.

মেণ্ডেল নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আকস্মিক ভাবে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে যে নূতন কোনো অনুকূল অবয়বের সৃষ্টি হয়, ইহা ঠিক নহে। গোড়াতেই জীবাণুর মধ্যে সকল প্রকারের অভিব্যক্তির বীজ থাকে। কোনটি এক পুরুষে কোনটি বা অপর পুরুষে প্রকটিত হয়। প্রথমবীজাণুতেই সকল প্রকার বীজ, এমন কি প্রতিভাশালী জ্ঞানীর বীজও বর্ত্তমান থাকে। ক্রমে ক্রমে এই সকলের অভিব্যক্তি হয়। বিকাশ (Evolution) ইহা ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাতে কোনো আকস্মিক সৃষ্টি (Fortuitous variation) ও নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা-জন্য নূতন সৃষ্টিও নাই ; ইহা যাহা আছে তাহারই অভিব্যক্তি।

এখন আমরা অল্প কথায় এই বলিতে পারি যে, জীবের বিকাশ সম্বন্ধে চারটি মত আছে। ডার্বিনের মতে, নূতন অবয়ব সৃষ্টি একটি আকস্মিক ব্যাপার। ইহা পরপুরুষে সংক্রামিত হয় এবং ধীরে ধীরে বংশপরম্পরায় উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করে। লেমার্কের মতে, এই অনুকূলাবয়বলাভ আকস্মিক ব্যাপার নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে লাভ হয় এবং

উত্তরপুরুষে সংক্রামিত হয়। বিস্‌মেনের মতে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবদেহে ঘটে না। ইহা জীবাণুতে ঘটে, এবং পরপুরুষে সংক্রামিত হয়। মেণ্ডেলের মতে, আকস্মিক ভাবে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না। আদি জীবাণুতেই সকল প্রকার উন্নত জীবের বীজসকল বর্ত্তমান আছে এবং Evolution ইহাদিগেরই অভিব্যক্তি।

বাস্তবিক Evolution এর অর্থ যদি বিকাশ হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা মেণ্ডেল বলেন, তাহাই প্রকৃত কথা। যাহা আছে তাহার প্রকটই বিকাশ। যাহা আগন্তুক, আকস্মিক ভাবেই হউক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই হউক, তাহাকে বিকাশ বলা সমীচীন নহে।

ডার্বিন প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে, বিকাশের গতি অতি মন্থর ; ধীরে ধীরে সহস্র সহস্র বৎসরে এক একটী উপজাতির প্রকট হয়। তাঁহাদের মতে, প্রকৃতি ধীরে ধীরে উন্নয়ন করায় ; কখনও উল্লম্ফন করিতে দেয় না। (Nature creeps but does not leap) কোনোও কোনো বৈজ্ঞানিক কিন্তু দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে উল্লম্ফন (saltation) ও আছে। এই হঠাৎ অতিমাত্রায় পরিবর্ত্তনকে mutationও বলে। মেণ্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া নিলে উল্লম্ফনের সুন্দর ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় ; এবং নির্ব্বোধ পিতামাতারও যে কখনো কখনো প্রতিভাশালী সন্তান লাভ হওয়া সম্ভব হয়, তাহার কারণও বাহির করিতে পারা যায়।

কোনোও কোনো দার্শনিক মনে করেন যে, মানুষের বুদ্ধি এবং ইতরপ্রাণীর বুদ্ধির মধ্যে এত পার্থক্য যে, ইহাদিগকে দুই ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। একটি যে অপরটির বিকাশ ইহা মনে করা যায় না। মানুষের জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান (self consciousness) অর্থাৎ "আমি জ্ঞাতা" এই জ্ঞানটি (apperception) সর্ব্বদাই জড়িত থাকে। ইতর প্রাণীরও জ্ঞান আছে, কিন্তু "আমি জ্ঞাতা" এই জ্ঞান নাই। এই ছাড়া মানুষের যুক্তি করিবার ক্ষমতা আছে—মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে। মানুষ যাহা করে তাহা জ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করে। ইতর প্রাণীর মধ্যে এই প্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার লক্ষণ দেখা যায় না। ইতর প্রাণীর আহার অন্বেষণ, পক্ষীসকলের নীড় নির্ম্মাণ এবং পিপীলিকা প্রভৃতির আহার সঞ্চয়ের চেষ্টা হইতে মনে হইতে পারে যে ইহারাও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু ইহারা জ্ঞাতসারে এই সকল কার্য্য করে না। প্রকৃতির প্রেরণা (instinct) দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইহারা এই সকল করিয়া থাকে। অবশ্য এই সকল কার্য্যে ইহাদিগের প্রয়োজন সাধিত হয়; কিন্তু যখন তাহারা এই সকল কার্য্য করে, তখন তাহাদিগের এই জ্ঞান থাকে না যে এই সকল কার্য্যের তাহাদিগের প্রয়োজন আছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে মানুষের বুদ্ধির প্রকৃতিই এক বিশেষ রকমের ইহাকে ইতরপ্রাণীর বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ফল বলা যাইতে

পারে না। মেণ্ডেলের মত অনুসারে, ইহাকেও আমরা প্রকৃতির উল্লম্ফনকরার একটি দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া মনে করিতে পারি।

এই স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। উপরে বলা হইয়াছে যে বিকাশবাদীদিগের মতে সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রমোন্নতি দ্বারা এক একটি উপজাতি (species) প্রকাশ হয়। সৃষ্টিবাদীরা বলেন, এই কথা ঠিক নহে। সৃষ্টির সময়ই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন যেরূপ আছে, সেইরূপই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। দার্শনিক প্লেটোর মতেও জাতি সকল পারমার্থিক। ইহাদিগের মধ্যে কোনোও পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইহারা আদি কাল হইতেই একরকমই আছে। ইহাকে বলে জাতির অবিক্রিয়ত্ব (immutability of species)।

এখন প্রশ্ন হইল, এই ক্রম-বিকাশ কি দেহগত না জীবগত—এই ক্রম-বিকাশ কি দেহের না আত্মার, না উভয়েরই ? বলা বাহুল্য যে, জড়তান্ত্রিক দার্শনিকদিগের মতে এই ক্রমবিকাশ দেহের ; এবং ইহার সঙ্গে তাঁহাদিগের মতেরও সামঞ্জস্য আছে। তাঁহাদিগের মতে, আত্মা বলিয়া কোনো স্থায়ী সত্তা নাই ; যাহাকে আমরা আত্মা বলি তাহা মস্তিষ্কের কার্য্য—একটা চৈতন্য-প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং উন্নততর আত্মা উন্নততর দেহেরই কার্য্য। এবং দেহের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও ক্রমোন্নতি ঘটে।

জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকগণ বলেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের বলা উচিত যে, ক্রমবিকাশ জীবগত। যদি তাহাই হয়, তবে উন্নততর জীবের উন্নততর দেহ লাভ হয় কি প্রকারে? উন্নততর আত্মা কি নিজেই তাহার উন্নততর দেহ রচনা করে, না অন্য কোনো শক্তি ইহার জন্য উন্নততর দেহ নির্ম্মান করিয়া এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটায়? প্রশ্নটি সরল: কিন্তু ইহার সরল উত্তর কোনো দার্শনিক দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহাদিগকে বলা হয় জন্মান্তরবাদী বা কর্ম্মবাদী। তাঁহারা বলেন, জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় এবং ইহাদ্বারা ইহার ক্রমোন্নতি ঘটে। কখনো কখনো অবনতিও ঘটে। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কার্য্য করিয়াছি, তাহার ফল ভোগের জন্য ইহজন্মে তদনুযায়ী দেহ লাভ করি। কর্ম্ম বলিতে কেবল শারীরিক কর্ম্ম বোঝায় না, বাসনা এবং চিন্তাও কর্ম্মশব্দবাচ্য। আমাদিগের স্থূল শরীরও আছে, সূক্ষ্ম শরীরও আছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেবল স্থূল শরীরই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর থাকিয়া যায়, এবং পরজন্মেও সঙ্গে সঙ্গে আসে। আমাদের প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক চিন্তা, এই সূক্ষ্মশরীরে পরিবর্ত্তন ঘটায়। সুবাসনা এবং সুচিন্তার ফল উন্নততর দেহ, কুচিন্তা এবং কুবাসনার ফল অপকৃষ্টতর দেহ। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য দ্বারাই, পর জন্মে কিরূপ দেহ লাভ হইবে তাহার উপাদান যোগাইয়া থাকি। মোটামুটি ভাবে ইহাই কর্ম্মবাদ। ইহা সত্য হইলে, উন্নততর দেহ নির্ম্মাণে

উন্নততর আত্মার কতকটা হাত আছে। অর্থাৎ আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই দেহেরও উন্নতি ঘটে। সুচিন্তা ও সুবাসনা দ্বারা কেবল যে, আত্মার উন্নতি হয় তাহা নহে, ইহার দেহের উন্নতি হয়। তেমন আবার কুচিন্তা এবং কুবাসনা দ্বারা উভয়েরই অবনতিও ঘটিয়া থাকে। অতএব এই মতানুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আত্মা এবং দেহের উন্নতি বা অবনতি সমান্তরাল।

এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ক্রমবিকাশের (Evolution এর) ব্যাখ্যার জন্য কর্ম্মবাদের কল্পনা করা হয় নাই। ইহার কল্পনা করা হইয়াছে অন্য একটি ব্যাপকতর জগৎ-ব্যাপারের ব্যখ্যার জন্য। সেইটি হইয়াছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য। ইহাত আমাদিগের অভিজ্ঞতারই বিষয় যে, জগৎ বৈষম্যপূর্ণ। আমরাত দেখিতেই পাই যে, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী ; কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী ; কেহ বড় কেহ ছোট। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময় এবং সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন ; যদি তাহাই হয় তবে, তাঁহার সৃষ্টিতে এই বৈষম্য কেন ? এত দুঃখ, এত কষ্ট কেন ? ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব এবং করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত না জন্মাইয়া সৃষ্টি বৈষম্যের ব্যাখ্যার জন্যই কর্ম্মবাদের কল্পনা। তবে, কর্ম্মবাদ দ্বারা এই সৃষ্টিবৈষম্যের নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা হয় কিনা, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিজ নিজ চিন্তার বিষয়। সৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য এবং বৈষম্য আছে, ইহা একটি নিষ্ঠুর সত্য। এই বিচিত্র কার্য্যের কারণও বিচিত্র হইবে। এই কারণ বা কারণ

সকল কি, বা কি কি, তাহা আমরা জানি না বলিয়াই ইহা-দিগকে বলা হয়, অদৃষ্ট কারণ বা এক কথায় অদৃষ্ট। 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিতে ইহাকে বলা হইয়াছে, অলৌকিক হেতু। এই অদৃষ্ট বা অলৌকিক হেতুটা কি হইতে পারে, তাহা নিরূপণের চেষ্টা হইতে কর্ম্মবাদের কল্পনা। বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ প্রভৃতি একার্থ বোধক।

কর্ম্মবাদ দ্বারা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একটা আপাততঃ সত্য ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে, মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, ইহার বিরুদ্ধেও একটি বড় কথা আছে। সেই কথাটি হইয়াছে এই,—স্বীকার করিলাম যে, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্টি বৈষম্য ঘটিয়াছে; ইহাতে ঈশ্বরের সমদর্শিতায় এবং কারুণ্যে ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু প্রথম জন্মে বৈষম্য আসিল কোথা হইতে? কর্ম্মবাদীরা বলেন, সৃষ্টি অনাদি, সুতরাং প্রথম জন্মে বৈষম্য আসিল কোথা হইতে, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইহা প্রশ্নটির উত্তর হইল না। ইহা হইল একটা গোজামিল মাত্র। ইহার সরল উত্তর হইত এই বলা যে কর্ম্মবাদ দ্বারাও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। ন্যায়দর্শনে সৃষ্টিবৈষম্যের কারণকে বলা হইয়াছে অদৃষ্ট বা অলৌকিক হেতু। এই কথাই ঠিক: ইহা পূর্ব্বেও অদৃষ্ট ছিল, এখনও অদৃষ্টই রহিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবাবিদ্‌দিগের মধ্যে কেহ কেহ, অদৃষ্ট কথাটিকে ইংরেজীতে fate শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াও কম গোলমাল সৃষ্টি করেন নাই।

প্লেটো বলেন যে, অংশের বৈচিত্র্যই অংশীর সৌন্দর্য্য, এবং সেইজন্যই জগৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সৃষ্টিবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, জগতে যাহা আমরা সুখ দুঃখ মনে করি তাহা আংশিক দৃষ্টির ফল। সমগ্র দৃষ্টিতে (sub specie aeternitatis এ,) যাহা আমরা দুঃখ মনে করি তাহা দুঃখ নাও হইতে পারে। এই সকল কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু জগতে যাহারা দুঃখ কষ্টে আছে, তাহারা এই সকল কথা দ্বারা সান্ত্বনা পাইবে কিনা ইহা অন্য কথা।

প্রকৃত কথা এই যে, অনির্ব্বচনীয়, বাক্যমনের অতীত, এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত যে ঈশ্বর, তাঁহার মধ্যে কতকগুলি ভাবাত্মক গুণ আরোপ করিয়া আমরা তাঁহাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে টানিয়া আনি এবং সেই সকল কাল্পনিক গুণের সহিত জগৎ-ব্যাপারের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক স্থলেই এই চেষ্টা যুক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, দ্বৈতবাদে জগতের উৎপত্তির কি প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই মতে, আদি কারণ চিৎ এবং অচিৎ এই উভয় শ্রেণীর সত্তা, এবং ইহাদিগের সংমিশ্রনেই জগতের উৎপত্তি। সুতরাং জড়বাদীদিগের নির্জীব হইতে সজীবের উৎপত্তি দেখাইতে যে সকল অসুবিধা আছে, এই মতে তাহা নাই। কিন্তু ইহারও একটি বিশেষ অসুবিধা আছে, ইহা হইয়াছে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে যে আদান প্রদান চলে তাহার ব্যাখ্যা লইয়া। জীবের জড়দেহও আছে, চৈতন্যবিশিষ্ট

আত্মাও আছে। ইহা সকলেরই জানা কথা যে, আত্মার ইচ্ছায় জড়দেহ সঞ্চালিত হয় এবং দেহের উত্তেজনা আত্মা অনুভব করে। ইহা হয় কি প্রকারে? ইহারা কি পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Reciprocal causality) বিশিষ্ট? জড় এবং চৈতন্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট সত্তা। দার্শনিক ডেকার্ট বলেন, আত্মা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, জড় সম্বন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য এবং দেহ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, আত্মা সম্বন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য। যাহা কিছু আত্মা তাহা দেহ নহে এবং যাহা কিছু দেহ তাহা আত্মা নহে। যদি তাহাই হইল, তবে দেহের উত্তেজনাই বা কি ভাবে আত্মায় এবং আত্মার ইচ্ছাই বা কি ভাবে দেহে সংক্রামিত হয়? এই আদান প্রদান চলে কিরূপে? ডেকার্ট নিজে ইহার কোনো সুমীমাংসা করিতে পারেন নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন যে, আমাদিগের পিনিয়েল গ্লেণ্ডে (Peneal glandএ) জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধিত হয়। বলা বাহুল্য ইহা কোনোও সুমীমাংসা নহে।

ডেকার্টের শিষ্য মেলব্রাঁস্ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ঈশ্বরই প্রত্যেক স্থলে এই যোগ ঘটান। যখনই আত্মায় কোন ইচ্ছার উদয় হয় তখনই তিনি ইহা দেহে এবং যখনই দেহে কোনো উত্তেজনা ঘটে তখনই তিনি তাহা আত্মায় সংক্রামিত করেন। এই মতের নাম অনিয়তকারণবাদ (occasionalism)। বলা বাহুল্য যে, এই মত দার্শনিক-দিগের নিকট সুমীমাংসা বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

দার্শনিক লাইব্‌নিট্‌ এই সমস্যার উত্তর দিয়াছেন আর একভাবে। তিনি বলেন, দেহের উত্তেজনা ও আত্মার অনুভূতি এবং আত্মার ইচ্ছা ও দেহের সঞ্চালন ইহারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে। এই সকল একটির সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরেই আর একটি ঘটে বটে ; কিন্তু ইহাতে কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশ করে না। সৃষ্টিকর্ত্তার অসাধারণ নিৰ্ম্মাণকৌশল প্রকাশ করে মাত্র। যেরূপ নির্দ্দোষ দুইটি ঘড়ি, ঠিক একই সময়ে একই ভাবে সময় দেখাইলে, আমরা ইহাতে ঘড়িনির্ম্মাতার নিৰ্ম্মাণকৌশল দেখি এবং একের সহিত অন্যের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মনে করি না, সেইরূপ দেহে ও আত্মার মধ্যে কার্য্যের আদান প্রদান দেখিয়া ইহাতে আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিনৈপুন্যই দেখা উচিত। দেহ এবং আত্মা এই ভাবে নির্ম্মিত যে, যখন একটিতে কোনও উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তখন অপরটীতেও তদনুযায়ী উত্তেজনা ঘটে। ঠিকমত চলে, এইরূপ দুইটী ঘড়ি এক সময় বাজিলে যেরূপ হয় সেইরূপ।

লাইব্‌নিট্‌ শক্তিবাদী, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার শক্তি-কণাসকলের প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর জ্ঞানও আছে। এই সকল কণাকে তিনি নাম দিয়াছেন মনেড্‌। এই মনেড্‌ সকল দ্বারশূন্য গৃহের ন্যায়। বাহির হইতেও কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ভিতর হইতেও কিছু বাহিরে যাইতে পারে না। এক একটি মনেড্‌ এক একটি জীব বীজ। ক্রমে উন্নত হইয়া প্রত্যেকটিই এক একটি আত্মা হইতে পারে ;

যে স্থলে কয়েকটি মনেড্ স্বেচ্ছায় একটি মনেডের অধীনতা স্বীকার করে, সেই স্থলেই জীবত্ব এবং যে স্থলে সেইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা নাই, সেই স্থলেই জড়ত্ব। আমাদের প্রত্যেকের আত্মা এক একটি মনেড্। দেহস্থ অন্যান্য মনেড্সকল ইহার অধীন হইয়া চলে; যতক্ষণ এই বশ্যতা ততক্ষণই জীবন—ইহার অভাবই মৃত্যু। দেহের প্রত্যেক অবয়বেরও এক একটি অধ্যক্ষ মনেড্ আছে। এই সকল মনেড্ও আত্মারূপ মনেডের অধীন এবং ইহার বশ্যতা স্বীকার করে,—অবশ্য স্বেচ্ছায়। জগতের সকল মনেডের উপর এক মনেড্ আছেন, ইনি ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান। লাইব্‌নিটের লেখার কোনো কোনো অংশ হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে, তিনি যেন ঈশ্বর মনেডের বাহিরেও এক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন যাহা দ্বারা জগৎব্যাপারের মধ্যে একটা পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য (Preordained harmony) রক্ষিত হয় এবং যাহাকে তিনি আখ্যা দিয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ম্মাণকৌশল।

এখন দেখা যাউক, অদ্বৈতবাদে সৃষ্টির ব্যাখ্যা কিরূপ এবং ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার কি বা কি কি কথা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অদ্বৈতবাদ তিন প্রকার। এক প্রকার অদ্বৈতবাদ, শাস্ত্রতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদ (Scholastic monism)। ইহাতে বলা হয় যে, আদি কারণ এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান চিন্ময় সত্তা (Spirit)। তিনি অবস্তু বা "কিছু না" হইতেই জড় এবং জীবরূপ উপাদান সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা জগৎ রচনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি নিয়মও করিয়া

দিয়াছেন যাহার অনুযায়ী হইয়া জগৎব্যাপার চলিতেছে। কোনো কোনো শাস্ত্রতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদী মনে করেন, ঈশ্বরও তাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া চলেন। অর্থাৎ তিনি কখনও এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদিগকে বলে নিয়মতন্ত্র ঈশ্বরবাদী (Diest)। তাঁহাদিগের মতের নাম নিয়মতন্ত্র ঈশ্বরবাদ (Diesm)। কোনো কোনো শাস্ত্রতান্ত্রিক ঈশ্বরবাদী মনে করেন, ঈশ্বর জগৎ-ব্যাপার পরিচালনার জন্য নিয়ম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে এই সকল নিয়মের অধীন নহেন। আবশ্যক বোধ করিলে, এই নিয়ম লঙ্ঘনও করেন এবং এইরূপ করেন বলিয়াই, কখনো কখনো অস্বাভাবিক ঘটনা (miracles) ঘটে। যাঁহাদিগের এই মত, তাঁহাদিগকে বলে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবাদী (Thiest)। তাঁহাদিগের মতের নাম স্বতন্ত্র ঈশ্বরবাদ (Thiesm)। নিয়মতন্ত্র ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত যুক্তির উপরে এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত প্রত্যাদেশ বা Revelationএর উপরে।

নিয়মতন্ত্র ঈশ্বরবাদই হউক বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরবাদই হউক, উভয় মতেই ঈশ্বর, জীব ও জড় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ; সুতরাং এই প্রকার অদ্বৈতবাদে, জড় হইতে জীবের উৎপত্তির কথাই উঠিতে পারে না। দেহের উত্তেজনা আত্মায় এবং আত্মার ইচ্ছা দেহে সংক্রমণের ব্যাখ্যায়, এই মত বলিতে পারে যে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, তাহার একটী নিয়ম এই যে, যে সময় আত্মাযন্ত্রের তার বাজিয়া উঠে সেই সময় দেহ যন্ত্রের তারও বাজিয়া উঠে ; অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ম্মাণকৌশলের উপর

ভার দিয়াই এই জাগতিক ব্যাপারটির একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহাতে আমরা লাইব্‌নিটেই আসিয়া পঁহুছি। সে যাহা হউক, ইহাও একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।

সৃষ্টিবাদ সত্য হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর অনাদিকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া কোনো এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোনো একটা প্রয়োজন সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে ঈশ্বরের পূর্ণতায় (perfectnessএ) ব্যাঘাত ঘটে। পূর্ণ কথার অর্থই অভাব বোধ না থাকা। অভাব বোধ আর অপূর্ণতা এককথা। ঈশ্বর কোনো এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করিয়া থাকিলে, কোনো একটা অভাব দূর করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছিলেন। সৃষ্টিবাদী দার্শনিক-দিগের মধ্যে, কেহ কেহ যে সৃষ্টিতত্ত্বের এই ক্রটি লক্ষ্য করিয়া, ইহা যে ক্রটি নয় তাহা দেখাইবার চেষ্টা না করিয়াছেন এমন নহে। সৃষ্টিবাদী দার্শনিকদিগের অগ্রণী সেনট্ অগষ্টিন্ বলেন, কালের ভাব সৃষ্টির বাহিরের কথা নহে (out side creation, there is neither time nor space)। ইহা সৃষ্টির ভিতরের কথা ; সুতরাং ঈশ্বর অনাদিকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রতান্ত্রিক দার্শনিক মতের (scholasticismএর) প্রতিষ্ঠাতা স্কোটাস্ এরিজিনা বলেন, ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টিও অনাদি (creation is an eternal and continuous act, an act without beginning or end)। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়

ছিলেন, সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে না। অগষ্টিন্ বলেন, ঈশ্বর কোনও একটা প্রয়োজন বশতঃ বা কোনো একটা অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথাও বলা যাইতে পারে না। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছাই আদি শক্তি, তাহার আবার কারণের অনুসন্ধান করার কোনও অর্থই থাকিতে পারে না। (The Divine will is the ultimate principle than which is nothing higher. It is useless and absurd to inquire into the final cause of creation)। ঈশ্বরের পূর্ণতার সহিত সৃষ্টিবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, এই সকল কথা, যুক্তির হিসাবে কতটা মূল্যবান, তাহা পাঠকদিগের নিজের বিবেচনার বিষয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সৃষ্টিবাদ, বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক-দিগের নিকট আদরণীয় নহে। "কিছু না" হইতে সৃষ্টি দার্শনিক চক্ষে একেবারেই যুক্তিহীন বলিয়া ঠেকে। ভারতীয় দার্শনিকগণ কেহই সৃষ্টিবাদী নহেন। এমন কি, শাস্ত্রমূলক বেদান্তদর্শনেও সৃষ্টিবাদের সমর্থন নাই। ভারতের প্রাচীনতম, দর্শন সাংখ্য। ইহাতে অবস্তু হইতে বস্তু সৃষ্টি অসম্ভব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—"নাবস্তুনঃ বস্তুসিদ্ধিঃ"। ইয়ুরোপের শাস্ত্র তান্ত্রিক দার্শনিকগণের মধ্যেও কেহ কেহ অবস্তু হইতে বস্তুসৃষ্টির সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্কোটাস্ এরিজিনা বলেন, সৃষ্টি অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যেরূপ সূর্য্য হইতে আলো এবং অগ্নি হইতে

তাপ বিস্ফুরিত হয়, তেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি (Divine nature) হইতে সৃষ্টি বিস্ফুরিত হয়। (The world emanates from God as light emanates from the sun and heat from fire)। ইহা,

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ,
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ,
প্রজায়ন্তে তত্রচৈবাপি যন্তি। (Munduk)

এই শ্রুতি বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। এরিজিনা আরো বলেন, বাইবেলে (scriptureএ) যে বলা হইয়াছে, 'কিছু না' হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এই 'কিছু না'র অর্থ, শূন্য নহে। ইহা অনির্ব্বচনীয় এবং অচিন্ত্য ঐশ্বরিক প্রকৃতি (Ineffable and in comprehensible beauty of the Divine nature)।

আর একজন শাস্ত্র-তান্ত্রিক দার্শনিক সেণ্ট্ এন্‌স্‌লেম্ বলেন, যে একেবারেই 'কিছু না' (absolute nothing) হইতে যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট বস্তু সকল ভাব (Idea) রূপে ঈশ্বরের মনে বর্ত্তমান ছিল। ইহা প্লেটোরই কথা। সে যাহা হউক, শাস্ত্র-তান্ত্রিক, দার্শনিক স্কোটাস এরিজিনা, এবং সেণ্ট্‌এন্‌স্‌লেমের সৃষ্টিবাদের ব্যাখ্যা সত্য বলিয়া ধরিয়া নিলে, সৃষ্টিবাদ আর সৃষ্টিবাদ থাকে না; ইহা হইয়া পড়ে বিকাশবাদ (Doctrine of Evolution)

এই'ত গেল শাস্ত্রমূলক অদ্বৈতবাদ বা সৃষ্টিবাদের কথা। এখন দেখা যাউক দার্শনিক (metaphysical) অদ্বৈতবাদে সৃষ্টিব্যাপারের ব্যাখ্যা কিরূপ। দ্রব্যতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদীদিগের (substantialists) মতে পারমার্থিক তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় দ্রব্য (substance); জ্ঞান এবং বিস্তার অর্থাৎ চৈতন্য এবং জড়ত্ব ইহার গুণ। এই জ্ঞান এবং বিস্তার সমান্তরালভাবে আছে বলিয়া ইহার অপর নাম সমান্তরালবাদ (parallelism or parallelistic monism)। ঈশ্বর দ্রব্যের দুইটি দিক (aspects), একটি জ্ঞান এবং অপরটি বিস্তার; যথায় জ্ঞান আছে তথায় বিস্তারও আছে। একটি বক্ররেখার উন্নতোদর (convexity) এবং নতোদরের (concavityর) ন্যায়, বস্তুমাত্রেরই জড়ত্ব এবং চৈতন্য এই উভয়ই আছে। সেইজন্য ইহাকে সর্ব্বচৈতন্যবাদ (panpsychism)ও বলা হইয়া থাকে। এই মতে, বস্তুমাত্রই সজীব সুতরাং ইহাকে সর্ব্ব-জীববাদও (Hylozoism) বলা যাইতে পারে। জগৎ, চিৎ ও অচিৎ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের বিকাশ বা প্রকার (mode)। সুতরাং এই মতে, জড় হইতে চৈতন্যের, নির্জ্জীব হইতে সজীবের উৎপত্তির কথাই উঠিতে পারে না। যখন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ইহার সাররূপে চিন্ময় ঈশ্বরদ্রব্য বর্ত্তমান, তখন আত্মার ইচ্ছানুসারে দেহের গতি এবং দেহের উত্তেজনানুযায়ী বেদনা বা অনুভূতি আত্মায় সংঘটিত হইবারও কোনও বাধা নাই। দেহের গতি ও আত্মার অনুভূতি একই বস্তুর দুইটি দিক মাত্র। এই মতানুসারে কোনও বিশিষ্ট জীবের

দেহ ও আত্মা এক ঈশ্বর-পদার্থের একটি বিশিষ্ট খণ্ড, ঐ খণ্ডের এক দিকে আত্মা আর এক দিকে দেহ। যাহাকে স্থূলদৃষ্টিতে দেহ ও আত্মার মধ্যে আদান প্রদান বলে, তাহা দুইটি পদার্থের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধাত্মক নহে। একই পরিবর্ত্তন (change) দুইরূপে অর্থাৎ মানসিক অবস্থারূপে ও দৈহিক গতিরূপে প্রতিভাত হয়।

জ্ঞানতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদ (Idealistic monism) মতে, দেহ এবং আত্মা, উভয়ই চৈতন্যের বিকাশ। উভয়ই বস্তুগত-ভাবে এক, সুতরাং ইহাতেও জড় হইতে চৈতন্যের, নির্জ্জীব হইতে সজীবের উৎপত্তির কথা উঠিতে পারে না। দেহ এবং আত্মা উভয়ই চিন্ময় বলিয়া আত্মা এবং দেহের মধ্যে আদান প্রদানের কোনও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে জড়তান্ত্রিকতায়, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি এবং দ্বৈতবাদে আত্মা ও দেহের মধ্যে আদান প্রদানের, যে দুইটি বড় সমস্যার কথা বলা হইয়াছে, দ্রব্যতান্ত্রিক এবং জ্ঞানতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদে ইহার একটা যুক্তি-যুক্ত মীমাংসা আছে। তবে কি এই দুই মতের বিরুদ্ধে কোনো বড় কথা নাই ?

এই প্রশ্নটির উত্তর দিবার পূর্ব্বে, আর একটি দার্শনিক প্রশ্নের মোটামুটি আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রশ্নটি এই :— আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of will) আছে কিনা ? অর্থাৎ কোন একটা কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছা করা না করার যে স্বাধীনতা (liberty of indifference) তাহা

আমাদিগের আছে কিনা? আরও সোজা করিয়া আমরা এই বলিতে পারি যে, আমরা কি স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা করি, না অন্য কোনও শক্তি, বাহিরেই হউক বা ভিতরেই হউক, আমাদিগকে ইচ্ছা করায়? এইটি একটি জটিল দার্শনিক প্রশ্ন। কেবল যে দর্শনের দিক দিয়া কথাটি জটিল তাহা নহে, ধর্ম্ম এবং নীতির দিক দিয়াও এইটি একটি বড় সমস্যা। ইচ্ছা করা না করার স্বাধীনতা যদি আমাদের না থাকে তবে নৈতিক দায়িত্বের কথাই উঠিতে পারে না; এবং নৈতিক দায়িত্ব না মানিলে ধর্ম্মের মূলেই করা হয় কুঠারাঘাত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই বিষয়ে দার্শনিকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে।

কোনও কোনও দার্শনিক বলেন যে, জাগতিক অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায়, আমাদিগের ইচ্ছা ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রত্যেক ইচ্ছারই কারণ আছে এবং এই কারণেরও কারণ আছে। কারণ থাকিলে কার্য্য ঘটিবেই। যদি তাহাই হয় তবে আমাদিগের ইচ্ছা করা বা না করার স্বাধীনতা কোথায়?—ইহাত হইয়া পড়ে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলরূপ নিয়তির অধীন। অনেক সময়, দুই বা ততোধিক কার্য্যের মধ্যে যখন আমরা কোনও একটা কার্য্য করিবার ইচ্ছা করি অথবা তদনুযায়ী কার্য্য করি, তখন মনে হয়, যেন আমরা স্বাধীন-ভাবেই ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু ইহা বুঝিবার ভ্রম মাত্র। যখন কোনো একটি কার্য্য করিব কি না করিব, এইরূপ প্রশ্ন মনে উঠে তখন বুঝিতে হইবে যে, এক কারণে কার্য্যটি করিবার ইচ্ছা ঘটাইয়াছে, এবং অন্য এক কারণ না

করিবার ইচ্ছা ঘটাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কারণ দ্বয়ের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত অধিক বলবৎ (stronger motive) সেইটি কার্য্যকরী হইয়া দাঁড়ায়। এমন কোনও ইচ্ছা নাই যাহার কারণ স্বরূপ একটা প্রয়োজন বা প্রেরণা (motive) না থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কারণ ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা ঘটায়। এবং যেটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবৎ (strongest motive) সেইটাই কার্য্যকারী হয় এবং তখন ঠিক না বুঝিয়া আমরা মনে করি যে, আমরা স্বাধীন ভাবেই এই ইচ্ছাটা করিলাম। প্রত্যেক ইচ্ছারই কারণ স্বরূপ একটা প্রেরণা (Impulse) থাকে। আবার সেই প্রেরণারও একটা কারণ আছে। এইভাবে কারণপরম্পরায় দেখা যায় যে, আমি এখন যে ইচ্ছা করিলাম, ইহা যে করিব, তাহা আদিকাল হইতে স্থির হইয়া আছে। আমাদের সকল ইচ্ছাই এই প্রকার নিয়তির অধীন। এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে বলে নিয়তিবাদী (determinist)। তাঁহাদিগের মতের নাম নিয়তিবাদ (doctrine of necessity or determinism)।

নিয়তিবাদের মূলকথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক সত্তাই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইচ্ছা একটি কার্য্য! ইহার কারণ থাকিবেই থাকিবে। নিয়তিবাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে বলিয়া থাকেন যে, অনেক সময় সকলগুলি অবস্থা জানা থাকিলে একটি লোক ভবিষ্যতে কি করিবে তাহা যে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, ইহার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে।

তাঁহাদিগের উল্লেখিত আর একটি প্রমাণ এই বলে যে, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়তির অধীন বলিয়াই প্রত্যেক বৃহৎ সমাজ বা জাতির মধ্যে, বিবাহ, আত্ম-হত্যা এবং আইন লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সংখ্যাও প্রতি বৎসর মোটের উপর একই থাকে। তাঁহাদিগের আর একটি কথা এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই আমা-দিগের ভবিষ্যৎ কার্য্যগুলি কি হইবে তাহা জানেন। পূর্ব্ব হইতে ঠিক না থাকিলে, পূর্ব্ব হইতে জানিবেন কি প্রকারে ?

নিয়তিবাদীদিগের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, আমাদিগের ইচ্ছার স্বধীনতা আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কয়েকটি কার্য্যের মধ্যে যখন কোনও একটি কার্য্য করিব বলিয়া ইচ্ছা করি, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবতী প্রেরণা আমাদিগকে এই ইচ্ছা করায়। ইহার অর্থ এই যে, আমরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া স্বাধীন ভাবেই বিচারপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া লই, কোন কার্য্যটি করিব। অবশ্য ইচ্ছা একটা কার্য্য এবং ইহার কারণও আছে। এই কারণ বাহিরের কোনও প্রেরণা নহে। ইহা আমা-দিগের বিচার বুদ্ধি (Reason)। আমরা নিজেই আমাদিগের ইচ্ছার নিয়ামক। যাঁহাদিগের এই মত, তাঁহাদিগকে বলা হয় স্বনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাবাদী (Self determinist) তাঁহা-দিগের মতের নাম স্বনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাবাদ (Self determinism or Libertarianism)

ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁহারা বলেন যে, আমাদিগের ইচ্ছা যে আমা-দিগের বিচার বুদ্ধি (reason) দ্বারা সংনিয়ন্ত্রিত হয় তাহা নহে, সম্পূর্ণরূপে বিচার বুদ্ধি নিরপেক্ষ ভাবেও আমাদিগের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য (Liberty of indifference) আছে। আমরা কোনো প্রকার বিচার না করিয়াও, কোনো কার্য্য করিব কিনা, তাহার ইচ্ছা করিতে পারি। বিচারপূর্ব্বক কোনো একটা কার্য্য ভাল মনে করিলেই যে ইহা করিতে ইচ্ছা করিব এবং ভাল মনে না করিলে ইহা করিবার ইচ্ছা করিব না, এমত নহে। ভাল কার্য্য করিতেও ইচ্ছা করিতে পারি মন্দ কার্য্য করিতেও ইচ্ছা করিতে পারি। এক কথায় আমাদিগের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য (Liberty of indifference) আছে। যাঁহাদিগের এই মত, তাঁহাদিগকে বলা হয় অনিয়তিবাদী (indeterminist)। তাঁহাদিগের মতের নাম অনিয়তিবাদ (indeterminism)।

যাঁহারা ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাঁহারা মোটের উপর আস্তিক। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহাদিগের কথা এই যে, আমাদের আত্মা যখন অসীম ঈশ্বরের সসীম অংশ বা বিকাশ, তখন ইহার স্থান ব্যবহারিক সত্তার (Phenomenal world এর) উপরে এবং সেই জন্যই ইহা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ঈশ্বরের স্বাধীনতাও অল্প বিস্তর ইহাতে আছে।

ক্যাণ্টের মত, নিয়তিবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদের মাঝামাঝি। তিনি বলেন, ব্যবহারিক জগতে (in the phenomenal world) আমরা সম্পূর্ণরূপে নিয়তির অধীন ; কিন্তু, পরমার্থিক বা আধ্যাত্মিক জগতে (In the noumenal world) আমাদিগের ইচ্ছা করা না করার স্বাধীনতা (Liberty of indifference) আছে।

জড়তান্ত্রিক দার্শনিকগণ, মোটের উপর নিয়তিবাদী (Determinist)। জড়তান্ত্রিকতায়, চৈতন্য দেহেরই কার্য্য, সুতরাং ইহাতে ইচ্ছার স্বাধীনতার কথাই উঠিতে পারে না।

দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ, আমাদিগের ইচ্ছা করা না করার স্বাধীনতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মতের সহিত ইহার অসামঞ্জস্য নাই। এই মতে, ঈশ্বর যেরূপ অনাদি, জীবাত্মাসকলও সেইরূপ অনাদি। ঈশ্বরের ন্যায় ইহারাও স্বাধীন ভাবে চিন্তা এবং ইচ্ছা করিতে পারে। রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্পর্ক। রাজা যেরূপ সকলের মঙ্গলের জন্য নিয়ম করেন এবং যাহারা ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহাদিগের শাস্তি দেন, তেমন ঈশ্বরও, সকলের মঙ্গলের জন্য নিয়ম করিয়াছেন, এবং যাহারা তাহা লঙ্ঘন করে, তাহারা শাস্তি পায়। ইহাতে তাঁহার কারুণ্যের কোনোও ব্যাঘাত ঘটে না। প্রজার যেরূপ রাজকৃত নিয়মানুসারে চলিবারও স্বাধীনতা আছে, লঙ্ঘন করিবারও স্বাধীনতা আছে, তেমন মানুষেরও ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী হইয়া চলিবারও স্বাধীনতা আছে, ইহা লঙ্ঘন করিবারও

স্বাধীনতা আছে। আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে; সুতরাং, আমাদিগের নৈতিক দায়িত্বও আছে।

অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সৃষ্টিবাদও এক অর্থে অদ্বৈতবাদ। কারণ ইহাতেও পারমার্থিক তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় চিন্ময় সত্তা। তিনি অবস্তু হইতেই (exnihilo) জীব ও জড়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মতের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে কি? সৃষ্টিবাদীরা বলেন, আছে। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, পাপাচরণ করিতেও ইচ্ছা করিতে পারে, পুণ্যাচরণ করিতেও ইচ্ছা করিতে পারে। ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী হইয়া চলাই পুণ্য, তাহা লঙ্ঘন করাই পাপ। পুণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ। ইহা ঈশ্বরের বিধান। ইহাতে তাঁহার কারুণ্যের ব্যাঘাত ঘটে না। যুক্তিটি আপাততঃ সমীচীন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু, একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে. ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ. সর্ব্বশক্তিমান এবং করুণাময়, এই কথা মানিয়া লইলে, ইহার সহিত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সামঞ্জস্য হয় না। ঈশ্বরই মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রত্যেকের প্রবৃত্তিও তাঁহারই দত্ত। কাহারও সৃষ্টি পাপ-প্রবৃত্তিসহ, কাহারও সৃষ্টি পুণ্য-প্রবৃত্তিসহ। এই ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কেহ পাপ করে, কেহ পুণ্য করে। যদি তাহাই হয়, তবে আর মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রহিল কোথায়? ইহাত ঈশ্বর দত্ত প্রবৃত্তিরূপ নিয়তিরই অধীন হইয়া পড়ে। যদি মনে করা

যায়, ঈশ্বর জানিয়া শুনিয়া এইরূপ প্রবৃত্তি দেন নাই, তবে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বে ব্যাঘাত ঘটে এবং যদি জানিয়া শুনিয়া এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে করুণাময় বলা যায় না। কোনো মানুষ সৃষ্টি করার সময় তিনি জানেন, সে পাপী হইবে, না পুণ্যাত্মা হইবে। পাপাত্মা সৃষ্টি করিয়া তাহাদ্বারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করানো, করুণার পরিচায়ক নহে। আর যদি এইরূপ করিয়াই থাকেন তবে আমরা নিয়তিরই অধীন হইয়াই পড়িলাম। ইচ্ছার স্বাধীনতার স্থান রহিল কোথায় ?

সেণ্ট্ অগষ্টিন একস্থানে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই নয় যে, সকল মানুষ উদ্ধার পায়। তিনি তাহাদিগের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যককে উদ্ধার করিবেন এবং যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদিগের কাহারও উদ্ধার হইবে না অর্থাৎ তাহারা অনন্তকাল কষ্ট পাইবে। সেণ্ট্ অগষ্টিনের মত পণ্ডিত এবং ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিও দেখিতে পান নাই যে, ইহাতে ঈশ্বরে কি পরিমাণ নৈষ্ঠুর্য্য আরোপ করা হইল। তিনি ইচ্ছা করিয়াই কতকগুলি মানুষ এই ভাবে সৃষ্টি করেন যেন, তাহারা পাপ করে, এবং চিরকাল দুঃখ ভোগ করে। ইহা তাঁহার লীলা হইতে পারে ; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই লীলা বড়ই নিষ্ঠুর লীলা।

প্রকৃত কথা এই যে, সৃষ্টিবাদও সত্য হইতে পারে এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাও সত্য হইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিবাদী ঈশ্বরে যে সকল গুণ আরোপ করেন, তাহার সঙ্গে এই স্বাধীন-

তার সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর যে অবাঙ্মনসগোচর ইহা মানিয়া নেন না বলিয়াই, অথবা মুখে মানিয়াও মনে মানেন না বলিয়াই, অনেক দার্শনিক তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত জগদ্‌ব্যাপারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না। মধ্যযুগের শাস্ত্র-তান্ত্রিক (Scholastic) দার্শনিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় অবাঙ্মনসগোচর। স্কোটাস এরিজিনা বলেন, "ঈশ্বর সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অতীত। দ্বন্দ্ব প্রকাশক কোনো গুণই তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। আমরা তাঁহাকে দয়াময় বলি, ইহা ঠিক নহে, কারণ দয়া এবং নির্দ্দয়তার পার্থক্য তাহাতে নাই; আমরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলি, কিন্তু ঈশ্বর শব্দ দ্বারা তাঁহাকে সম্যকরূপে প্রকাশ করা যায় না; আমরা তাঁহাকে সত্য বলি, কিন্তু সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে; আমরা বলি, তিনি অনাদি অনন্ত, কিন্তু তিনি দেশ ও কালের অতীত; আমরা বলি তিনি চৈতন্য এবং প্রকাশক, কিন্তু জীবন এবং মৃত্যু, আলো এবং অন্ধকার এই সকলের দ্বন্দ্ব তাঁহাতে নাই। তাঁহাকে কোনো বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এমন কি, তিনি যে সৎ তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, সতের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে অসতে। অতএব ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় এবং ধারণার অতীত—অবাঙ্মনসগোচর। তিনি দয়ারও উপরে, সতেরও উপরে, অনাদিত্ব ও অনন্তত্বেরও উপরে, চৈতন্যেরও উপরে, আলোরও উপরে, ঈশ্বরেরও উপরে, অস্তি নাস্তিরও উপরে। তিনি এক সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তা

বা শূন্যতা—"গুহ্যাৎ গুহ্যতম রহস্য"। এই বাক্যগুলি পড়িবার সময় মনে হয় যেন আমরা ভারতীয় ঋষির লিখিত নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনাই পাঠ করিতেছি।

এইত গেল monothistic monism বা এক ঈশ্বরবাদের কথা। এখন দেখা যাউক দার্শনিক (metaphysical) অদ্বৈতবাদের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে কি না। অবশ্য অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, সামঞ্জস্য আছে। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত কি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, না এই স্বাধীনতা না থাকিলে নৈতিক দায়িত্ব থাকে না, এবং ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, এই ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ?

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতে, জীব একভাবে না একভাবে ঈশ্বরের বিকাশ বা অংশ। ঈশ্বর স্বয়ং স্বাধীন, সুতরাং ঈশ্বরের অংশ জীবেও অল্প বিস্তর এই স্বাধীনতা থাকিবেই থাকিবে। এই যুক্তিটি আপাততঃ সমীচীন মনে হইবে ; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই যুক্তি দ্বারাও সমস্যাটির সুমীমাংসা হয় না। জীবকে ঈশ্বরের অংশ মনে করিয়া ইহাতে ঈশ্বর নিরপেক্ষ স্বাধীনতার কল্পনা করা যে যুক্তির দিক দিয়া নির্দ্দোষ নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। ঈশ্বর স্বাধীন, ইহার অর্থ কি ? ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে ভালও করিতে পারেন, মন্দও করিতে পারেন, পাপও করিতে পারেন, পুণ্যও করিতে পারেন। এই কি ? ঈশ্বর পাপ করিতে পারেন, কোনও ঈশ্বর বিশ্বাসীই এই কথা বলিবেন না। ঈশ্বরের স্বভাবই পবিত্রতা ; সুতরাং ঈশ্বরের

স্বাধীনতায়, তাঁহাকে ইহার বাহিরে লইয়া যাইবে না। যদি জীবের স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বাধীনতারই অংশ হয়, তবে এই স্বাধীনতাও জীবকে পাপাচরণ করাইতে পারে না। অথচ আমরা দেখি, জীব পাপ করে। তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, জীব হয় বাধ্য হইয়া পাপ করে, না হয়, জীবের স্বাধীনতার প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের স্বাধীনতার প্রকৃতি এক নহে। বাধ্য হইয়া পাপ করিলে, নিয়তিবাদ আসিয়া পড়ে, আর স্বাধীনভাবে পাপ করিলে, ইহার স্বাধীনতা ঈশ্বর নিরপেক্ষ স্বাধীনতা হইয়া পড়ে। জীব ঈশ্বরের অংশ সুতরাং ইহাতে ঈশ্বর নিরপেক্ষ স্বাধীনতা আসিতে পারে না। জীবের কৃত পাপও ঈশ্বরকৃত পাপ হইয়া পড়ে। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এইস্থানে আমরা আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা, তাহার বিচার করিতেছি না; আমরা বিচার করিতেছি, অদ্বৈতবাদের সহিত এই স্বাধীনতার যুক্তি-যুক্তরূপে সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহার। আমার মনে হয়, অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র ঠিক রাখিয়া এই সামঞ্জস্য দেখানো সহজ ব্যাপার নহে। অদ্বৈতবাদও ঠিক হইতে পারে এবং জীবের স্বাধীনতাও ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বিশুদ্ধযুক্তি দ্বারা এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখানো যাইতে পারে না। অবশ্য অদ্বৈতবাদীরা যে ইহা দেখাইবার জন্য যুক্তির অবতারণা না করিয়াছেন, তাহা নহে; তবে সূক্ষ্মবিচারে, এই সকল যুক্তির একটিও নির্দ্দোষ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

অদ্বৈতবাদীরাও যে তাঁহাদিগের যুক্তির দুর্ব্বলতা না দেখেন তাহা নহে। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের সকলের মধ্যেই অল্প বিস্তর কতগুলি নৈতিক জ্ঞান (moral consciousness) বর্ত্তমান আছে যাহা কখনও বা প্রবুদ্ধ অবস্থায় কখনও বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ক্যাণ্ট ইহাদিগের নাম দিয়াছেন, নৈতিক স্বতঃসিদ্ধ (Postulates of practical reason)। তিনি বলেন, এই স্বতঃসিদ্ধই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, পাপের ফল দুঃখ এবং পুণ্যের ফল সুখ। কিন্তু সংসারে ত ইহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। এমনওত দেখা যায় যে, পাপী ব্যক্তি চিরজীবন সুখে এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তি চিরজীবন দুঃখে কাটায়। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, মৃত্যুর পরও আমরা থাকিব, এবং একজন বিধাও আছেন, যিনি পাপ পুণ্যের জন্য আমাদিগের শাস্তি ও পুরস্কার বিধান করেন। আমাদের এই নৈতিক জ্ঞান (moral consciousness) আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। আমরা ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারি, পুণ্যও করিতে পারি, সুতরাং আমাদিগের নৈতিক দায়িত্বও আছে। এই জ্ঞানের উপরই আমাদিগের নীতি এবং ধর্ম্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। ইহা প্রকৃতপক্ষে যুক্তির কথা নহে, ; ইহা হইল আমাদিগের জীবনের মূলীভূত বিশ্বাসের কথা।

এমনও দেখা যায় যে, কোনো কোনো দার্শনিক যখন দেখিতে পান যে, তাঁহার নিজের দার্শনিক মতের ন্যায়ানুযায়ী সিদ্ধান্ত, তাঁহাকে তাঁহার নৈতিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে লইয়া যায়,

তখন তিনি নিজেই তাঁহার মতের এই পরিণতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। তিনি যে তাঁহার দার্শনিক মত পরিত্যাগ করেন, তাহা নহে; তিনি তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত তাঁহার নৈতিক বিশ্বাসের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করেন এবং এইজন্য, নানা প্রকার যুক্তিরও অবতারণা করেন। কিন্তু অনেক সময়ই এই সকল যুক্তি দুর্ব্বল থাকে। এমন কি, কখনও কখনও ইহাদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট হেত্বাভাস থাকিলেও তাহা তাঁহাদিগের চক্ষে পতিত হয় না। এই বিষয়ে দর্শন এবং ধর্ম্ম শীর্ষক প্রকরণে অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

জড়তান্ত্রিক এবং জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকগণ, সকলই বিকাশবাদী। তাঁহাদিগের মতের মধ্যে পার্থক্য এই যে জড়তান্ত্রিকগণ মনে করেন যে, এই বিকাশ এক অন্ধ শক্তির কার্য্য; ইহার পশ্চাতে কোনো সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি নাই। জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকগণ মনে করেন, যে শক্তি দ্বারা এই বিকাশ চলিয়া আসিতেছে ইহা এক সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি, ইহার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই এই বিকাশ প্রবাহের গতি। এখন দেখা যাউক এই দুই মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে, কি, বা কি কি কথা আছে।

উদ্দেশ্যমূলক বিকাশবাদীদিগের কথা এই যে, জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে যে সকল শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্বতঃই মনে হওয়া উচিত যে ইহার পশ্চাতে এক

সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি রহিয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের গতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, জগতের সৃষ্টি বৈচিত্রের মধ্যেও একটি একত্ব রহিয়াছে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা সকল পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদিগের সৌর জগতের সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ সকল পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে, তাহাদিগের একটির মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিলে অপর গুলিতেও ইহায় কার্য্য লক্ষিত হয়। সকল গুলিই যাহার যাহার কক্ষে থাকিয়া সমগ্রের সুশৃঙ্খলারূপে চলিবার সাহায্য করে। আমাদিগের সৌরজগতের ন্যায় আরও সহস্র সহস্র সৌরজগত আছে। সকলের মধ্যেই এই সুচিন্তিত শৃঙ্খলাও আছে। এই সৌরজগৎ সকল সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বহুত্বের মধ্যে একত্বের পরিচয় দিতেছে। জীবজগতের দিকে লক্ষ্য করিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়। জড় উদ্ভিদের খাদ্য যোগাইতেছে, উদ্ভিদ নিম্ন শ্রেণীর জীবের এবং নিম্ন শ্রেণীর জীব উচ্চ শ্রেণীর জীবের খাদ্য যোগাইতেছে। এই স্থলেও একটি সুসম্বন্ধ এবং সুচিন্তিত ক্রমোন্নতির সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে। জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সকল পরীক্ষা করিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়। একটি চক্ষু বা কর্ণের মধ্যে যে নির্ম্মাণ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে বিনা উদ্দেশ্যে এবং আকস্মিক ভাবে হইয়াছে তাহা কিছুতেই মনে হয় না।

এখন প্রশ্ন হইল সেই উদ্দেশ্য কি? অবশ্য, বিধাতা কি উদ্দেশ্যে জগৎ ব্যাপার চালাইতেছেন তাহা তিনি ছাড়া আর কে বলিবে। তবে যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ যে, এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, জগতের এই প্রকার বিকাশ দ্বারাই ঈশ্বর নিজকে জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করেন। ইহা তাহার স্বভাব; এই বিকাশ অনাদি এবং অনন্ত; ইহাতেই ঈশ্বর মূর্ত্ত।

জড়তান্ত্রিক দার্শনিকগণ যে এই যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা বলেন কয়েকটি জাগতিক ব্যাপারে মাত্র সুশৃঙ্খলা দেখিয়া যুক্তিবাদীগণ বিকাশকে উদ্দেশ্যমূলক এবং সজ্ঞানে পরিচালিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাদিগের তুলনায় এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহাদিগের মধ্যে সজ্ঞানে পরিচালিত কোনোও শক্তির লক্ষণ দেখা যায় না। পৃথিবীর মধ্যেই বাস করিবার অযোগ্য কত শীত এবং মরু-প্রধান স্থান আছে যাদিগের অস্তিত্বের কোনোও প্রয়োজন দেখা যায় না। কত আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে যাহা দ্বারা আমাদিগের অনুপকার ব্যতীত কোনোও উপকার সাধিত হয় না। জগৎব্যাপারের পশ্চাতে কোনো সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি থাকিলে আমাদিগের চন্দ্র সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত যে, আমরা সর্ব্বদাই পূর্ণচন্দ্র উপভোগ করিতে পারিতাম। অনেক জীবের মধ্যে এমন সব অঙ্গ আছে যাহা দ্বারা ইহাদিগের কোনোই প্রয়োজন সাধিত হয় না। এমন কি কোনোও কোনো জীবের কোনো কোনো অঙ্গ তাহাকে বিপদেই ফেলিয়া

থাকে, যেমন মধুমক্ষিকার হুল যাহা শত্রুশরীরে বিদ্ধ হইলে আর বাহির হয় না এবং মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এক প্রকার মৃগ আছে যাহাদিগের শৃঙ্গ বহু শাখা বিশিষ্ট, ইহা অনেক সময় তাহাদিগের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে পুরুষের স্তনের কোনোও প্রয়োজন নাই, অথচ তাহাদিগের মধ্যে অপরিস্ফুট স্তনের চিহ্ন রহিয়াছে। সুতরাং জাগতিক ব্যাপারের কোনোও কোনো বিষয় সুশৃঙ্খলা এবং সঙ্গবদ্ধতা হইতে, যেমন সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়, তেমন আবার অসংখ্য জগৎ ব্যাপার রহিয়াছে, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, এই সকল আকস্মিক (fortuitous) এবং ইহাদিগের পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্যমূলক সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তি নাই।

এই সকল কথার উত্তরে উদ্দেশ্যমূলক বিকাশবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে ইহা হইতে এই কথা বলা যায় না যে জগতের পশ্চাতে কোনোও উদ্দেশ্য নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন। তাহার শুভইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যে বিঘ্ন জন্মাইতে পারে এইরূপ আর একটা শক্তি আছে। ইহা মানিলে অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না। ইহা হইয়া যায় পারসিকদিগের দুই ঈশ্বরবাদ।

যদি স্বীকার করা যায় যে, জগৎ রচনা একটা সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তির কার্য্য, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যশূন্য সজ্ঞানে পরিচালিত শক্তির কার্য্য অর্থশূন্য। আরিষ্টটল্ কারণের একটি সুন্দর

লক্ষণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক কারণের মধ্যে আকৃতির কল্পনা (design), উপাদান (material), শক্তি (power) এবং উদ্দেশ্য (End) বর্ত্তমান থাকে। প্রথমতঃ যিনি কিছু নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার মনে মনে, যে বস্তু নির্ম্মিত হইবে, ইহার আকৃতির একটা ভাব থাকে। দ্বিতীয়তঃ যে উপাদানে ইহা নির্ম্মিত হইবে তাহাও থাকা চাই। তৃতীয়তঃ যে শক্তি প্রয়োগে বস্তুটি নির্ম্মিত হইবে তাহারও প্রয়োজন। তারপর যে উদ্দেশ্যে বস্তুটি নির্ম্মিত হইবে তাহারও স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। এই শেষোক্তটিকেই বলা হয় End বা fiinal cause। প্রকৃত প্রস্তাবে যে বস্তুটি নির্ম্মিত হইবে, তাহার উদ্দেশ্যের অনুযায়ীই আকৃতির কল্পনা (design) হইয়া থাকে। একজন কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণের কথা ভাবা যাউক। অবশ্য ইহাতে উপাদান স্বরূপ মাটির এবং নির্ম্মাতার ঘটনির্ম্মাণের শক্তির প্রয়োজন থাকেই। ঘটটির আকৃতির যে কল্পনা (design) কুম্ভকারের মনে মনে থাকে, তাহা উদ্দেশ্যের অনুযায়ীই হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য বা Endকে final cause না বলিয়া first cause বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম প্রকরণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ।

আস্তিক দার্শনিকদিগের মতে, জগৎ ব্যাপারের নিয়ন্তা, এক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, মঙ্গলস্বরূপ পারমার্থিক সত্তা। এই সত্তাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তাঁহারা যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, অল্প কথায় তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহা-দিগের প্রদত্ত একটি যুক্ত এই :—জগৎ ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইহা একটা পরিবর্ত্তন প্রবাহ। এমন কোনোও ব্যাপার নাই, যাহার আদি নাই। সুতরাং আমরা মনে করিতে পারি যে, জগৎ আদিমৎ—ইহার আরম্ভ আছে। অতএব ইহা একটি কার্য্য। কারণ, যাহার আদি আছে, তাহাই কার্য্য। দার্শনিক মিল প্রদত্ত কার্য্যের লক্ষণ ইহাই। ভারতীয় দার্শনিকগণও আরম্ভ থাকাকেই কার্য্যের লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কথাটা তাঁহারা একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, এই মাত্র পার্থক্য। তাঁহাদিগের মতে, যাহার পূর্ব্বে অভাব ছিল তাহাই কার্য্য। "প্রাগভাবত্বং কার্য্যত্বম্"। "প্রাগভাবত্বম্" আর "আদিমত্বম্" একই কথা।

জগৎ যদি একটা কার্য্য হয়, তবে ইহার কারণ থাকিবেই। কারণ, কারণশূন্য কার্য্য অর্থশূন্য। বলা যাইতে পারে যে, এই কারণেরও কারণ থাকিতে পারে। হা, থাকিতে পারে। কিন্তু এইরূপ কারণ পরম্পরায় এমন এক কারণে পঁহুছা

যাইবে, যাহার আর কারণ নাই. যাহা কারণ শূন্য কারণ, যাহা স্বয়ম্ভূ। এইরূপ এক স্বয়ম্ভূ স্বীকার না করিলে যুক্তিতে অনবস্থা (Regressus ad infinitum) দোষ ঘটে। এই আদি কারণ বা স্বয়ম্ভূই ঈশ্বর।

কোনোও কোনো দার্শনিক বলেন যে, এই জগৎ যখন একটা দৃশ্য (Phenomenon), তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই দৃশ্যের পশ্চাতে, ইহা যাহার দৃশ্য, সেই সত্তাও বর্ত্তমান আছে। কারণ, প্রত্যেক ব্যবহারিক সত্তার ভিত্তি স্বরূপ ইহার পশ্চাতে এক পারমার্থিক সত্তা আছেই আছে। সমগ্র দৃশ্যমান জগদ্‌ব্যাপারই একটা ব্যবহারিক সত্তা। ইহার পশ্চাতেও এক পারমার্থিক সত্তা আছে এবং এই পারমার্থিক সত্তাই ঈশ্বর।

বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিরূপিত সত্য সকল হইতে এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইবে না যে, এই বৈচিত্রপূর্ণ, এবং আপাতদৃষ্টিতে বহু বলিয়া প্রতীয়মান জগদ্‌ব্যাপার সকলের পশ্চাতেও একটি একত্ব (Unity in diversity) রহিয়াছে। সুতরাং জগতের কারণও এক অদ্বয় সত্তা। আর এক কথা এই, যাহা কারণ তাহা শক্তি বা শক্তিমান সত্তা। কারণ, যাহা কারণ, তাহা, তাহার শক্তি দ্বারাই কার্য্য ঘটায়।

জড় তান্ত্রিক দার্শনিকগণ এই কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছু নহে। যাহাকে কার্য্য বলি তাহা, যাহাকে কারণ

বলি. তাহার অব্যবহিত পরে ঘটে, আমরা এই মাত্রই জানি ; কারণ কার্য্য ঘটায়, ইহা কেহ কখনও দেখে নাই। জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকগণ বলেন, আমাদিগের নিজের কৃতকার্য্য অর্থাৎ হস্ত পদাদির সঞ্চালনজন্য কার্য্য হইতেই আমরা জানি যে, আমাদিগের কৃতকার্য্য আমরা শক্তি দ্বারাই করিয়া থাকি। প্রত্যেক কার্য্যই শক্তিমূলক—শক্তিই ঘটায়। আদি কারণও ইহার শক্তি দ্বারাই জগৎ ব্যাপার ঘটায়। সুতরাং আদি কারণ শক্তিমান।

এই শক্তি কি অন্ধ শক্তি ? জড়-তান্ত্রিক দার্শনিকগণ বলেন, ইহা অন্ধ শক্তি। জ্ঞানতান্ত্রিক এবং অন্যান্য আস্তিক দার্শনিকগণ বলেন যে, জগদ্‌ব্যাপারের সুশৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, এই শক্তি সচেতন অথবা সজ্ঞানে পরিচালিত ; সুতরাং আদি কারণ ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব এবং সর্ব্ব-নিরপেক্ষত্ব বিষয়ে আস্তিক দার্শনিক ডক্টর ফ্লিণ্টের একটি যুক্তি এই যে, আমাদিগের মনের মধ্যে যে সর্ব্ব নিরপেক্ষত্ব এবং পূর্ণত্বের ভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা কোথা হইতে বা কেমন করিয়া এই সকল ভাব পাইলাম, এই বিষয়ে মতান্তর বা সন্দেহের অবকাশ আছে ; কিন্তু এই সকল ভাব যে আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ বা মতদ্বৈধ নাই। জগতে এমন কোনও সত্তা নাই যাহাতে এই সকল গুণ আরোপ করা যাইতে পারে। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগদ্-

ব্যাপারের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যে আদি কারণ স্বয়ম্ভুর অস্তিত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাঁহাতেই এই সকল গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই সকল যুক্তিতে কার্য্য হইতে কারণের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে বলিয়া, ইহাদিগকে বলা হয় কারণিক যুক্তি (causal argument)। জগদ্‌ব্যাপারকে কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে জগদ্‌ব্যাপারের কারণানুসন্ধানমূলক অথবা এক কথায় জাগতিক যুক্তি (cosmological argument) ও বলা হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্যান্‌ট তাঁহার নৈতিক স্বতঃসিদ্ধ (Postulates of Practical Reason) দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদিগের নৈতিক জ্ঞান (moral consciousness) আমাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দেয় যে, পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। কিন্তু জগতে অনেক সময় ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আজীবন পাপ করিয়াও সুখেই দিন কাটায়। আবার কেহ কেহ আজীবন পুণ্য করিয়াও দুঃখেই দিন কাটায়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই জন্মেই আমাদিগের আত্মার শেষ হয় না, মৃত্যুর পরও ইহা থাকে এবং আমাদিগের কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে এবং এই ফলদাতা একজন বিধাতাও আছেন। এই বিধাতাই ঈশ্বর। এই প্রকার

যুক্তিকে বলা হয় নৈতিক-জ্ঞানমূলক যুক্তি (moral argument)।

আর এক প্রকার যুক্তি আছে যাহার গোড়ার কথা এই যে, যে সত্তার আদবেই কোনো অস্তিত্ব নাই তাহার কোনো ভাবই আমাদিগের মনে উদয় হয় না। আমাদিগের মনে, এক অসীম পূর্ণ এবং সর্ব্বনিরপেক্ষ সত্তার ভাব (idea) বর্ত্তমান আছে। জগতে যাহা কিছুর আমাদিগের প্রত্যক্ষানুভূতি আছে, তাহদিগের মধ্যে এমন কোনোও সত্তা নাই যাহা পূর্ণ অসীম এবং সর্ব্বতো-ভাবে অন্য নিরপেক্ষ। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, যে, এই সকল ভাব যাঁহার অনুযায়ী তেমন এক সত্তাও আছেন, যিনি আমাদিগের মনে এই সকল ভাবের উদয় করান। এই প্রকার যুক্তিকে বলা হয় প্রত্যয় বা ভাবানুযায়ী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসমূলক অথবা এক কথায় সাত্তিক যুক্তি (ontological argument)। প্রসিদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে ডেকার্টের লিখাতে এই প্রকার যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরেও যে কোনোও আস্তিক দার্শনিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই প্রকার যুক্তির অবতারণা না করিয়াছেন তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এন্‌সেল্‌মের (Anselm) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্যান্‌ট্, ডেকার্টের যুক্তির সমালোচনা করিতে যাইয়া বলেন যে, যদি কোনও সত্তার ভাব (idea) মনে উদয় হইলেই সেই সত্তা যে প্রকৃত পক্ষে আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়, তবে আমার পকেটে শত মুদ্রা আছে মনে করিয়া পকেটে হাত দিলে

শত মুদ্রা লাভ হওয়া উচিত। ক্যান্টের পূর্ব্বে গনিলো (Gaunelo) এন্সেল্মের ontological যুক্তির সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি ভাবানুযায়ী সত্তা থাকিতেই হয়, সমুদ্রের মধ্যে স্বর্ণ দ্বীপের ভাব মনে হইলে, ঐরূপ দ্বীপের অস্তিত্বও থাকা উচিত। সুতরাং ontological যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা নূতন কথা নহে। কিন্তু ক্যান্টের এই ব্যঙ্গোক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ডেকার্টের যুক্তির প্রকৃত ভাব এই যে, আমাদের প্রত্যেক প্রত্যয় (idea)ই প্রত্যক্ষ মূলক, যাহা প্রত্যক্ষ করা হয় নাই তাহার কোনো প্রত্যয়ই মনে উদয় হয় না। ইহাত ক্যাণ্টেরই কথা। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার অস্তিত্ব আছে ; সুতরাং, আমাদিগের প্রত্যেক ভাব বা প্রত্যয়ের অনুয়ায়ী সত্তাও আছে। বলা যাইতে পারে যে আমরা ত আকাশে উড্ডীয়মান একটি অশ্বের ভাব মনে আনিতে পারি, তাহা বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে যে ঐরূপ অশ্বেরও অস্তিত্ব আছে ? কথাটি একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতে হইবে। যিনি অশ্ব দেখিয়াছেন, পাখাও দেখিয়াছেন এবং উড়িয়া যাওয়া ব্যাপারও দেখিয়াছেন কেবল তিনি ঐরূপ একটা অশ্বের ভাব মনে অনিতে পারেন। যিনি অশ্ব বা অশ্বের ছবিও দেখেন নাই, পাখাও দেখেন নাই, উড়িয়া যাওয়ার ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করেন নাই, তিনি কি আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে এমন কোনো অশ্বের ভাব মনে আনিতে পারিবেন ? তাহাত পারিবে না। ক্যাণ্টের যদি মুদ্রার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিত, পকেটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিত, তবে তিনি পকেটে শত মুদ্রার ভাবও

মনে আনিতে পারিতেন না। ভাব বা প্রত্যয় (idea) যখন প্রত্যক্ষ-মূলক, এবং প্রত্যক্ষ যখন এক ভাবে না এক ভাবে সত্তার অস্তিত্ব-মূলক, তখন ভাব বা প্রত্যয়ের সঙ্গেও এক ভাবে না এক ভাবে অস্তিত্বের যে সম্বন্ধ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ডেকার্টের কথা এই যে, প্রত্যয়-মাত্রই যখন বাস্তবের অস্তিত্ব-মূলক, এবং আমাদিগের মনে যখন পূর্ণ, অসীম এবং সর্ব্ব নিরপেক্ষ এক সত্তার প্রত্যয় আছে, তখন মনে করিতে হইবে যে, এইরূপ এক সত্তাও আছে, এবং এই সত্তা হইতেই আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়। আমরা এই বলিতেছিলা যে, যুক্তির হিসাবে এই যুক্তিটি নির্দ্দোষ; তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, ইহাও তাহাদিগের ন্যায় একটি। আর বিশেষতঃ প্লেটোর মতের অনুকরণে, যদি পূর্ণত্বের ভাবকেই ঈশ্বর বলা হয়, তবে ত এই কথায় কোনো দোষই থাকে না।

হেগেলের দার্শনিক মতের মধ্যেও সাত্তিক যুক্তির সমর্থন আছে। হেগেলের মতে, শেষ বিচারে জ্ঞান এবং সত্তা (Thought and being) একই কথা। যদি তাহাই হয়, তবে আমাদিগের মনের মধ্যে যে এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের জ্ঞান বা ভাব রহিয়াছে, ইহাত সত্তাই।

পূর্ণমাত্রায় সাপেক্ষবাদী স্পেন্‌সারের লিখাতেও সাত্ত্বিক যুক্তির সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, যখনই আমাদিগের জ্ঞানের সাপেক্ষিকতা প্রমাণের জন্য কোনাও যুক্তির অবতারণা করি, তখন, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নিরপেক্ষের ও

অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হয়। নিরপেক্ষকে জানিতে পারা যায় না এই কথার মধ্যেই নিরপেক্ষ যে আছে তাহা মানিয়া লওয়া হয়; এমন কি, নিরপেক্ষ যে আছে ইহা মানিয়া লওয়া আমাদিগের জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য্য। ইহা হইতে, ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার স্বরূপ কি তাহা জানিবার কোনোও উপায় নাই।

আর এক প্রকার যুক্তি আছে যাহাকে বলা হয়, উদ্দেশ্য-মূলক যুক্তি (Teleological argument)। এই যুক্তির প্রধান কথা এই যে জগতের সুশৃঙ্খলা, সুনিয়ম এবং জাগতিক ব্যাপার সকলের পরস্পরের মধ্যে যে সঙ্গবদ্ধতা আছে, তাহা দেখিয়া স্বতই মনে হয় যে, এই জগদ্ব্যাপার একটি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সত্তা দ্বারা কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত হইতেছে। এই সত্তাই ঈশ্বর।

এই যুক্তি, এক ভাবে না এক ভাবে, কারণিক যুক্তির (Causal argument)ই অন্তর্ভূত। বাস্তবিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যত প্রকার যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে এই যুক্তিটির আসন যে সর্ব্বোচ্চ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতীয় দর্শনেও, এক ভাবে না এক ভাবে, এই প্রকার যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর যে আছে ইহা একটি সার্ব্বজনীন বিশ্বাস (Universal Consent)। যাহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস

তাহার সত্যতায় সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। সার্ব্বজনীন বিশ্বাসের গোড়াতে, সত্য থাকিতে পারে, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সার্ব্বজনীন বিশ্বাস আছে কি না, ইহা বিচারের বিষয়। যদি ইহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, জড়তান্ত্রিক দার্শনিক-গণের মনের কথা এক এবং তাঁহাদিগের দার্শনিক মত অন্য। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে, ন্যায় এবং সাংখ্যেও সার্ব্বজনীন বিশ্বাসের (বিশ্ববৃত্তির) প্রমাণস্বরূপে অবতারণা দেখা যায়।

কেহ কেহ বলেন, যে, আমাদের মনের এমন একটা স্বাভাবিক বৃত্তি (intuitive faculty) আছে যে, কোনো কোনো বিষয়ের সত্যতা, প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবেই ইহার মধ্যে উদয় হয়। এই বৃত্তি, যেরূপ জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ সকল যে সত্য তাহা প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবেই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, তেমন ঈশ্বর যে আছেন, এবং তিনি যে জগদ্ব্যাপারের নিয়ামক, তাহাও আমাদিকে প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবেই বলিয়া দেয়।

কোনোও কোনো আস্তিক দার্শনিক বলেন যে, কখনও কখনও ঈশ্বর স্বয়ং কোনো কোনো ঋষির (Prophetএর) নিকট নিজকে প্রকাশ করেন (reveals Himself)। তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই ঋষিদিগের বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভারতীয় দার্শনিকদিগের ভাষায় এই সকল ঋষিবাক্যকে বলে শ্রুতি। বেদান্ত দর্শন শ্রুতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরবাদ (Theism) ও ঋষিবাক্যে (Revelationএ) বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় প্রত্যেক আস্তিক দর্শনেই শ্রুতি বাক্য প্রমাণ

স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের প্রকাশ (Revelation) ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি কৃপা করিয়া নিজকে প্রকাশ করিলে তবে তাঁহাকে জানা যায়। তাহা না হইলে কোনো প্রকার সাধনা দ্বারা তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, এমন কতকগুলি সাধনা আছে যাহা ঠিক ঠিক রূপে অনুসরণ করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের এবং কতক পরিমাণে তাহার স্বরূপেরও অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। এই দুই মতেরই পোষকতা আছে, এইরূপ শ্রুতিবাক্যও আছে। যে উপায়ে অপরোক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে জানিতে পারা যায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা পাতঞ্জল দর্শনে আছে ; ইহাই পাতঞ্জল দর্শনের বিশেষত্ব। ইহার সার কথা এই যে, যদি আমরা সর্ব্বপ্রকার অনাত্ম বস্তুকে চিন্তাপথ হইতে অপসৃত করিয়া আত্মস্থ হইতে পারি, তবেই আমরা অপরোক্ষ ভাবে ঈশ্বকে জানিতে পারি।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের আর এক প্রকার যুক্তি আছে। আমাদিগের পাপ পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কার দাতা একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় বিধাতাপুরুষ আছেন, এই বিশ্বাস এবং আছেন কি নাই এই সন্দেহ, এই উভয়ের মধ্যে কোনটা, মঙ্গলদায়ক, কোনটা, ব্যক্তির পক্ষে, সমাজের পক্ষে এবং জগতের পক্ষে অধিক উপকারী ? এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয়ই বলা হইবে, এইরূপ বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসই অধিক উপকারী। সুতরাং জগতের মঙ্গলের দিক দিয়া দেখিলে যখন দেখা যায় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় অপেক্ষা বিশ্বাসই অধিক

উপকারী, তখন ঈশ্বর যে আছেন ইহাই সত্য। এই প্রকার যুক্তিকে বলা হয় সমাজের মঙ্গলদায়কবিশ্বাসমূলক যুক্তি (Pragmatic argument)। ভারতীয় কোনও আস্তিক দর্শনে, এই প্রকার যুক্তির অবতারণা আছে বলিয়া মনে হয় না ; তবে কোনোও কোনো ধর্ম্ম উপদেষ্টাকে এই প্রকার যুক্তির অবতারণা করিতে শোনা গিয়াছে।

আস্তিক দার্শনিকদিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময় এবং সর্ব্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ ও জগদ্‌ব্যাপারের নিয়ামক। তিনি সর্ব্বতোভাবে অন্য-নিরপেক্ষ (absolute) হইলেও তাঁহার শাসন নীতিমূলক (moral)। ইহার অর্থ এই যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং এই শাসনে পাপীর শাস্তির এবং পুণ্যাত্মার পুরস্কারের বিধান আছে।

ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং করুণাময় হয়েন তবে তাঁহার জগতে অমঙ্গল (Evil) প্রবেশ করিল কি প্রকারে? ইহার সহিত ত সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, করুণাময়ত্ব এবং মঙ্গলময়ত্বের সামঞ্জস্য দেখা যায় না। জগতে যে অমঙ্গল আছে ইহা ত আমাদিগের অভিজ্ঞতারই বিষয়। অমঙ্গলও দুই রকমের, নৈতিক এবং ভৌতিক (moral and physical)—ভারতীয় দার্শনিকদিগের ভাষায়, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক।

যাহা আধ্যাত্মিক অমঙ্গল, তাহাই পাপ। ইহার বিষয়ে আস্তিক দার্শনিকদিগের কথা এই যে, ঈশ্বর মানুষকে, কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য তাহা জানিবারও শক্তি দিয়াছেন এবং

জানিয়া শুনিয়াই, একটি বা অপরটিকে পরিহার বা গ্রহণ করিবার, স্বাধীনতাও দিয়াছেন। কখনো কখনো, মানুষ স্বাধীন ভাবেই মঙ্গল গ্রহণ না করিয়া অমঙ্গলের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ করে বলিয়াই, পাপও আমাদিগের চরিত্রে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায়। যাহারা মঙ্গলের অনুসরণ করে তাহারা সুখলাভ করে, যাহারা অমঙ্গলের অনুসরণ করে, তাহারা দুঃখ পায়। ইহাতে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে এবং করুণাময়ত্বে দোষ স্পর্শ করে না। এই কথাটি, কঠোপনিষদে একটি সুন্দর শ্রুতি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরাঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

(ঈশ ১।২।২)

শ্রেয় এবং প্রেয়—পারমার্থিক মঙ্গল এবং সংসারের আপাতমধুর সুখ, মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পায়েন এবং প্রেয়কে উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন; কিন্তু যাহারা অজ্ঞ তাহারা যোগক্ষেমবশতঃ শ্রেয়কে উপেক্ষা করিয়া প্রেয়কে বরণ করে।

ঈশ্বর পাপ সৃষ্টি করেন নাই; মানুষ পাপ করুক, এই ইচ্ছাও করেন নাই। তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন,

ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও দিয়াছেন। মানুষ ঈশ্বরের এই মহৎ দানের অপব্যবহার করিয়াই জগতে পাপ আনিয়াছে।

আর এক কথা এই যে, এই জগৎ আমাদিগের শিক্ষা এবং নৈতিক উন্নতির জন্য বল বৃদ্ধি করিবার স্থল। বল বৃদ্ধির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন, স্বাধীনতারও প্রয়োজন। তাই, ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতাও দিয়াছেন, ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন এবং পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নৈতিক শক্তির বৃদ্ধি করিবার সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন। যদি তাহা না করিতেন, যদি আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকিত, নৈতিক দায়িত্ব না থাকিত, তবে মানুষ এবং ইতর জন্তুর মধ্যেও কোনোও পার্থক্য থাকিত না; মানুষ একটা সজীব কলের পুতুলের মত হইয়া পরিত।

আধিভৌতিক অমঙ্গল অর্থাৎ দাবানল, ঝড়, অনাবৃষ্টি, মহামারি প্রভৃতি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহার ত সন্দেহ নাই? সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এবং মঙ্গলময়ের রাজ্যে এই সকল অমঙ্গল আসে কোথা হইতে? আস্তিক দার্শনিকগণ বলেন, এই সকলের দ্বারাও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব এবং করুণাময়ত্বে দোষ স্পর্শে না। আমাদিগের দৃষ্টি, জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ। সমগ্র দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে, আমরা হয়ত দেখিতে পাইতাম যে, এই সকল আপাতদৃষ্টিতে অমঙ্গলকর ঘটনা সকলও সমগ্রের মঙ্গলের জন্য। আমরা যেসকলকে দুঃখ কষ্ট বলিয়া মনে করি, তাহা সমগ্রদৃষ্টিতে

(Sub specie æternitatis) দুঃখকষ্ট নাও হইতে পারে। পরিণামে হয়ত সকলই মঙ্গলদায়কই হইবে।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, মঙ্গলময়ত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বের সহিত তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের প্রবেশ এবং অস্তিত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই এই সকল যুক্তির অবতারণা করা হয়। যুক্তি সকল যুক্তি হিসাবে নির্দ্দোষ কি না এবং এই সকল দ্বারা এই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কি না, ইহা পাঠকগণের নিকট বিবেচনার বিষয়। তবে, একটি কথা এই যে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব করুণাময়ত্ব এবং অপাপবিদ্ধত্বের সহিত, তাঁহার সৃষ্ট, বা এক ভাবে না এক ভাবে অংশ, জীবের পাপ পুণ্যের জন্য দায়িত্বের মধ্যে যে একটা অসামঞ্জস্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং এই জন্যই কোনো কোনো সৃষ্টি-বাদী (scholastic) দার্শনিককে ও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈশ্বর অবাঙমনসগোচর। তাঁহাতে কোনোও গুণ আরোপ করিলেই তাঁহাকে খর্ব্বকরা হয়। তিনি সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অতীত। এমন কি, অস্তিনাস্তিরূপ দ্বন্দ্বেরও অতীত। আমরা মানুষের মধ্যে যে সকল গুণকে শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া মনে করি, সেই সকল গুণকে যথাসম্ভব বাড়াইয়া ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকি এবং ইাহা করি বলিয়াই সব দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিনা।

জীবাত্মা।

আত্মার লক্ষণ কি? যাহার চৈতন্য বা জ্ঞান (Consciousness) আছে তাহাই আত্মা। চৈতন্য কি? ইহার লক্ষণ কি? চৈতন্যের সহিত তুলনা করা যায় এমন কোনোও দ্বিতীয় বস্তু নাই। এমন কোনোও পদার্থ-শ্রেণী নাই, চৈতন্যকে যাহার অন্তর্ভূত দেখানো যাইতে পারে। সুতরাং চৈতন্যের লক্ষণ (definition) দেওয়া সম্ভব নহে। ইহা স্বলক্ষণ বিশিষ্ট। তবে "যৎতৎ" অর্থাৎ "যাহা তাহা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া চৈতন্য বস্তুটা কি, তাহার একটা বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক জন দার্শনিক বলেন, আমরা যখন নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন যাহা হারাই এবং জাগ্রত হইল পুনরায় যাহা ফিরিয়া পাই, তাহাই চৈতন্য। সে যাহাই হউক, চৈতন্যের লক্ষণ দেওয়া সম্ভব না হইলেও চৈতন্য কি তাহা আমরা সকলেই জানি, এবং এই বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধও নাই।

আত্মা সম্বন্ধে তিনটি দার্শনিক মত আছে। জড়-তান্ত্রিক-দিগের মতে, আত্মা বলিয়া কোনোও স্থায়ী সত্তা নাই। যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহা আমাদিগের মস্তিষ্কের কার্য্যরূপ একটা চৈতন্য প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নহে। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা, আমরা যে অনুভব করি, চিন্তা করি এবং ইচ্ছা করি, এই সকল জানিতে পারি। আত্মা এই সকল অবস্থার একটা প্রবাহ মাত্র। ইহাদিগের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া কোনোও স্থায়ী সত্তা নাই। সুতরাং আত্মা একটি ব্যবহারিক

সত্তা (Phenomenon) মাত্র। এই প্রকার আত্মাকে বলা হয় ব্যবহারিক আত্মা (Phenomenal or Emperical self)।

জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, আত্মা কেবল অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা প্রবাহ নহে, ইহা একটি স্থায়ী পারমার্থিক সত্তা যে অনুভব করে, চিন্তা করে এবং ইচ্ছা করে। কিন্তু এই সকল ইহার অপবিহার্য্য নহে। এই সকল অবস্থা বিযুক্ত হইয়াও আত্মা থাকিতে পারে, যেমন গভীর নিদ্রার সময়। আত্মা এই সকল অবস্থা নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্তা (noumenal or ontological self)।

আত্মা সম্বন্ধে তৃতীয় প্রকার দার্শনিক মত এই যে, অনুভব করা, চিন্তা করা এবং ইচ্ছা করা আত্মার স্বভাব ; এই সকল ইহার অপরিহার্য্য। এই সকল অবস্থা যুক্ত আত্মাই মূর্ত্ত আত্মা (Concrete self) অন্যথা ইহা এক কাল্পনিক সত্তা। ইহাকেই বলা হয় দার্শনিক আত্মা (Philosophical or metaphysical self)।

এইত গেল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক মত সকলের কথা। এই সকল মতে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ, তাঁহাদিগের নিজ নিজ মত সমর্থণের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, অল্প কথায় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে. জড়তান্ত্রিক দার্শনিকদিগের মতে, আত্মা মস্তিষ্কের কার্য্য স্বরূপ একটা চৈতন্য প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং ইহাতে স্থায়ীত্বের কথাই উঠে

না। তাঁহারা বলেন মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞানের উন্নতি হয়, ইহা ত আমাদিগের অভিজ্ঞতারই বিষয়। যেমন শিশুর মস্তিষ্ক হইতে বয়স্ক ব্যক্তির মস্তিষ্ক অধিক পুষ্ট, তেমন, শিশুর জ্ঞান হইতে বয়স্ক ব্যক্তির জ্ঞানও অধিক পরিপক্ক। আবার, বৃদ্ধত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ মস্তিষ্কের ক্ষয় ঘটে, তেমন জ্ঞানের পরিপক্কতারও ক্ষয় ঘটিতে দেখা যায়। সুতরাং জ্ঞান বা চৈতন্য যে দেহের কার্য্য ইহাতে সংশয় থাকা উচিত নহে। ভারতীয় চার্ব্বাক দার্শনিকদিগেরও এই কথা। তাঁহারা বলেন

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥

তণ্ডুলকণা সকলের বিকার হইতে যেরূপ মদশক্তির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মন আমাদিগেয় দেহের জড় উপাদান পরমাণু সকলের কার্য্য হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়।

জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকদিগের মতে, আত্মা এক স্থায়ী চিন্ময় সত্তা যিনি অনুভব করেন, চিন্তা করেন এবং ইচ্ছা করেন। জড়-তান্ত্রিকদিগের মতের বিরুদ্ধে, তাঁহাদিগের একটি যুক্তি এই যে, আত্মাকে দেহের কার্য্য মনে করিলে ইহার সহিত বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত শক্তির অবিনশ্বরত্বের (conservation of Energyর) সামঞ্জস্য থাকে না। শক্তির অবিনশ্বরত্ব কথার অর্থ এই যে, জগতে যে মোট শক্তি আছে, তাহার ন্যূনাধিক্য নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি, একে অন্যে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু কোনোও শক্তির নিরন্বয় বিনাশ বা ধ্বংস নাই।

মোট শক্তির পরিমাণ সর্ব্বদাই এক। জড়-তান্ত্রিকদিগের মতে চিন্তা করা, ইচ্ছা করা প্রভৃতি এক প্রকার মস্তিষ্কের কার্য্য; কিন্তু চিন্তা করিয়া যে চিন্তা শক্তির, এবং ইচ্ছা করিয়া যে ইচ্ছা শক্তির ন্যূনতা ঘটে, এমন কোনোও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইহাই দেখা যায় যে, অনুশীলনদ্বারা এই সকল শক্তি বৃদ্ধিই পায়। আর এক কথা এই যে, চিন্তা করিয়া যে চিন্তা শক্তির ক্ষয় হয়, অথবা তাহা রূপান্তর হইয়া অন্য কোনোও শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, এমনও কোনো প্রমাণ নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে চিন্তা ইচ্ছা প্রভৃতি জড় মস্তিষ্কের কার্য্য নহে। এই যুক্তিটি সমীচীন হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কেননা আমরা চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারা যে শক্তি ব্যয় করি, তাহা অন্য কোনো শক্তিতে পরিণত হইয়াছে এই প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ইহা বলা যাইতে পারে না যে, এই প্রকার পরিণতি অসম্ভব।

আত্মার অস্তিত্ব এবং স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে যত প্রকার যুক্তি আছে, তাহার মধ্যে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, যখনই আমরা অন্তর্দৃষ্টিপাত করি তখনই অনুভব করিতে পারি যে, একটি সত্য সকল প্রকার যুক্তির উপরে ভাসিয়া উঠে। সেই সত্যটি এই যে "আমি আছি"। কোনো প্রকার যুক্তিই "আমি আছি" এই প্রত্যয়টি চাপিয়া রাখিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের যত প্রকার বাস্তবতার (realities) জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে "আমি"র বাস্তবতার জ্ঞানই সকলের উপরে। আমি বাস্তব বলিয়াই অন্যান্য বাস্তব-

তার জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সেই জন্য কোনোও কোনো দার্শনিক আত্মার বাস্তবতাকেই বলেন আদর্শ বাস্তবতা (type of all realities)। বাস্তবিক আমাদিগের যতপ্রকার নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যে "আমি আছি" এই জ্ঞানটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চয়াত্মিক। আমার মধ্যে এক স্থায়ী 'আমি'র অস্তিত্বে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই। 'আমি'ই পারমার্থিক তত্ত্ব কি, তাহা নিরূপণ করিতে চাই। 'আমি'ই কোনো স্থায়ী সত্তা আছে কিনা, তাহা জানিতে চাই। আমি নিজে স্থায়ী না হইলে, কোনো স্থায়ী সত্তা আছে কিনা, ইহা আমি নিরূপণ করিব কি প্রকারে? আমি যে, এইরূপ কোনো সত্তা আছে কি না, তাহা নিরূপণ করিতে চাই, আমার অস্তিত্বের এবং স্থায়ীত্বের, ইহাই একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমার মধ্যে এক স্থায়ী 'আমি' আছে, ইহা নিশ্চয়। ইহা আমার এক প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানেরই বিষয়। আমার মধ্যে যেমন এক স্থায়ী 'আমি' বা আত্মা আছে, রাম, শ্যাম, যদুর মধ্যেও তেমন কোনো সত্তা আছে কি? অন্যের মধ্যে কোনো স্থায়ী 'আমি' আছে কিনা, ইহার আমার সাক্ষাৎ অনুভূতি নাই; কিন্তু উপমান প্রমাণের (analogyর) সাহায্যে আমি, নিশ্চয় ভাবেই জানিতে পারি যে, তাহারা প্রত্যেকের মধ্যেও এক স্থায়ী 'আমি' বা আত্মা আছে। আমার দুইটি নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান এই যে, আমার মধ্যে 'আমি' বলিয়া এক জ্ঞাতা আছে এবং রাম, শ্যাম প্রত্যেকের মধ্যেও আমার 'আমি'র ন্যায় এক স্থায়ী জ্ঞাতা আছে। এই আত্মা সকল

একই, না ভিন্ন ভিন্ন, না এক সর্ব্বব্যাপী আত্মার অংশ বা বিকাশ, এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু ইহারা যে আছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নহে।

দেহাতিরিক্ত স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ যুক্তি হইয়াছে আত্মার তাদাত্ম্যানুভূতি (consciousness of personal identity), যে আমি দশবৎসর পূর্ব্বে কলেজে ছাত্র ছিলাম, সেই আমিই এখন অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছি ; যে আমি কাল এই অশ্বত্থ বৃক্ষটি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই আজ ইহার ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি ; এই প্রকার স্পষ্ট জ্ঞান সকলেরই আছে। ইহাই আত্মার তাদাত্ম্যানুভূতি। আত্মা যদি দেহের কার্য্য হয় এবং চৈতন্য প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু না হয়, তবে স্মৃতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। আত্মার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে যত প্রকার যুক্তি আছে তাহার মধ্যে স্মৃতি সংক্রান্ত যুক্তিই একটি শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

ভারতীয় নৈয়ায়িকগণেরও স্মৃতিপ্রমাণের উপরই ঝোঁক বেশি। তাঁহারা বলেন, "নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যো নৈকং ভূতমপক্রমাৎ।" আমাদিগের সকলেরই অভিজ্ঞতার বিষয় এই যে, একজন যাহা দেখিয়াছে, তাহা অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। যিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন কেবল তিনিই তাহা স্মরণ করিতে পারেন। আমাদিগের দেহ স্থায়ী সত্তা নহে। ইহাতে অবিশ্রান্তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সাত বৎসর পূর্ব্বে আমার দেহে যে সকল অণু পরমাণু ছিল তাহার একটিও

এখন ইহাতে বর্ত্তমান নাই। দেহকে "আমি" মনে করিলে সাত বৎসর পূর্ব্বের "আমি" এবং এখনের "আমি" এক "আমি" নই। অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বের অনেক কথা আমার মনে আছে—আমি স্মরণ করিতে পারি। একজন যাহা দেখিয়াছে, অন্যে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বের "আমি" যাহা দেখিয়াছিলাম, সাত বৎসর পরের "আমি" তাহা স্মরণ করিতে পারি। ইহা হয় কিরূপে? স্বীকার করিতেই হইবে, "আমি" দেহ নহি, "আমি" দেহাতিরিক্ত সত্তা। দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আত্মার পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইহা এক স্থায়ী সত্তা।

আত্মা যে দেহাতিরিক্ত সত্তা, এই বিষয়ে সাংখ্য দার্শনিক-গণেরও কয়েকটি যুক্তি আছে। দুই একটির উল্লেখ, এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহাদিগের একটি যুক্তি, "সঙ্ঘাত-পরার্থত্বাৎ"। ইহার অর্থ এই যে, যখন আমরা একাধিক প্রয়োজনীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখি, যেমন খাট, শয্যা মশারি প্রভৃতির, তখন আমরা মনে করি যে, এই বস্তুসকলের সমাবেশ কাহারোও ব্যবহারের জন্য। আমাদিগের দেহও ইন্দ্রিয়াদির সমাবেশ; সুতরাং আমরা মনে করিতে পারি যে, ইহাও কাহারো ব্যবহারের জন্য। এই দেহ যাঁহার ব্যবহারের জন্য, তিনিই আত্মা।

তাঁহাদিগের আর একটি যুক্তি, "অধিষ্ঠানাৎ"। যদি আমরা দেখি যে, একটি মোটারকার আঁকা বাঁকা পথে ঠিক যাইতেছে, তবে আমরা মনে করিতে পারি যে, ইহার মধ্যে

একটি চালক আছেন এবং সেই চালকই ইহাকে সজ্ঞানে চালাইতেছেন। সেইরূপ আমাদিগের দেহের গতি হইতেও আমরা মনে করিতে পারি যে, ইহারও একজন চালক আছেন। এই চালকই আত্মা।

মানিলাম যেন, দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মা আছে। ইহা কি দেহ যতদিন আছে ততদিনই থাকে, না ইহা দেহের পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। অর্থাৎ আত্মা কি অনাদি এবং অমর? ইহার কি আদি আছে অন্ত নাই, না আদিও নাই অন্তও নাই?

আত্মা এক রস বস্তু (Simple substance)। ইহার বিনাশ হইবার কোনোও কারণ নাই। কোনোও বস্তুরই একান্ত বিনাশ হয় না। আত্মার কেন একান্ত বিনাশ হবে? যে সকল মিশ্র বস্তু অর্থাৎ যাহারা বিভিন্ন বস্তুর একত্রীকরণে নির্ম্মিত (Compound things) তাহাদিগের রূপান্তর ঘটিতে পারে, এবং এই রূপান্তরকেই আমরা সাধারণত বিনাশ বলিয়া থাকি। আত্মা একরস বস্তু (Simple element), ইহার রূপান্তর বা বিনাশ হইবে কি প্রকারে? মৃত্যুতে দেহের রূপান্তর ঘটে; আত্মার রূপান্তর ঘটা সম্ভবপর নহে। সুতরাং আত্মা অমর।

ডেকার্ট বলেন, আত্মা এবং দেহ সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট। যাহা কিছু দেহের ধর্ম্ম, তাহা আত্মাতে নাই, যাহা কিছু আত্মার ধর্ম্ম তাহা দেহে নাই। আমরা ত দেখিতেই পাই যে, দেহ ধ্বংসশীল (Liable to decomposition)

সুতরাং ইহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব আত্মা অবিনাশী।

আস্তিক দার্শনিক ডক্‌টর মর্টিনোর একটি যুক্তি এই যে, আমাদিগের বুদ্ধির (intellectএর) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাই যে, ইহার মধ্যে যে জ্ঞান পিপাসা আছে, তাহা এই জন্মে নিবৃত্ত হইতে পারে না। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে থাকি ততই আরও জ্ঞানলাত করিতে চাই। এই জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন আছে, তাহা না হইলে এই জ্ঞান পিপাসার পরিতৃপ্তি হইতে পারে না।

তাঁহার আর একটি যুক্তি এই যে, আমাদিগের আত্মার স্বভাবই এই যে ইহা উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিতে চায়—পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে চায়। এই জন্মে ইহা লাভের সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থা লাভের জন্য মৃত্যুর পরেও ইহার অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন।

তাঁহার আর একটি যুক্তি, নৈতিক দায়িত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা, ক্যান্‌টের নৈতিক যুক্তির (moral argument)ই ন্যায়। আমাদিগের সকলের মনেই একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। ইহ জীবনে অনেক সময় তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে, যে, এই সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার জন্য মৃত্যুর পরও আমরা থাকিব।

ভারতীয় নৈয়ায়িকদিগের একটী যুক্তি হইয়াছে "জাতস্য স্তন্যাভিলাষাৎ" শিশু জন্ম হইবা মাত্রই মাতৃ স্তন্য পাণ করিতে চায়। পূর্ব্ব জন্মে স্তন্য পানের সংস্কার না থাকিলে, জন্ম মাত্রই এই জ্ঞান লাভ করিবে কি প্রকারে? অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, জন্মের পূর্ব্বেও আমাদিগের আত্মা ছিল। জন্মের পূর্ব্বে থাকিলে, মৃত্যুর পরে না থাকিবার কোনোও কারণ নাই।

সাংখ্য দর্শনের একটি যুক্তি এই, "কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ"। মনুষ্য মাত্রই কৈবল্য লাভ করিতে চায়। কৈবল্য শব্দের অর্থ আত্মার কেবলতা, কেবলমাত্র স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে দেহ হইতে বিনির্মুক্তাবস্থা। সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে আত্মার বিনাশ হয় না তাহা নয়, আত্মা ইচ্ছাই করে দেহ হইতে বিনির্মুক্তাবস্থা লাভ করিতে। দেহ ধারণটা ইহার বন্ধন—অসুখের অবস্থা। দেহবিনির্মুক্ত থাকাই ইহার মুক্তি এবং স্বাধীন অবস্থা। প্লেটোর লেখাতেও আত্মার স্থায়িত্ব প্রমাণের জন্য এই যুক্তিটির অবতারণা আছে।

ষষ্ঠ প্রকরণ

দর্শন ও নীতিবাদ

নীতিবাদের গোড়ার কথাই এই যে, আমাদিগের, যে কোনো বিষয়েই হউক না কেন, ইচ্ছা করা বা না করার স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছা করা না করার স্বাধীনতা না থাকিলে নৈতিক দায়িত্বের কথাই উঠিতে পারে না। নৈতিক দায়িত্ব

বলিতে কি বোঝায়? নীতি বলিতে আমরা আমাদিগের কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্যের জ্ঞান বুঝিয়া থাকি। যাহা দ্বারা আমরা পাপ কি, পুণ্য কি, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, ভাল কি, মন্দ কি, এই সকল জানিতে পারি তাহাই নৈতিক জ্ঞান। পাপ পুণ্য, ভালমন্দ, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতি কথা কার্য্য বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। এই সকলের ভিত্তি কি? কোন্ সাধারণ সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আমরা পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, এবং ভাল মন্দের বিচার করিব? এই সকল বিচারের জন্য আমাদিগের মনের মধ্যে একটা নৈতিক আদর্শ (moral standard) থাকা প্রয়োজন। আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য কি তাহা স্থির থাকা উচিত। এই আদর্শ বা লক্ষ্যই হইবে আমাদিগের নৈতিক কার্য্যের নিয়ামক। এই আদর্শ অনুযায়ী হইয়া চলাই পুণ্য এবং ইহার বিপরীত কার্য্যানুষ্ঠানই পাপ। যদি আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য হয় সুখলাভ, তবে যে কার্য্য করিলে আমরা ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি, তাহা হইবে পুণ্য কার্য্য এবং যে কার্য্য ইহার বাধা জন্মায়, তাহা হইবে পাপকার্য্য। যদি আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য হয়, ভগবানের আদেশ মানিয়া চলা তবে ইহা মানিয়া চলাই পুণ্য এবং না চলাই পাপ। যদি আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য হয়, পূর্ণতালাভ করা, নিজকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাওয়া, তবে যাহা ঐ অবস্থা লাভের সাহায্য করে, তাহাই পুণ্য এবং যাহা ইহার বাধা জন্মায় তাহাই পাপ।

এই সকল কথা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আদর্শ বা লক্ষ্যের তারতম্যানুসারে নৈতিক জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদিও নৈতিক আদর্শ সকলের মধ্যে নানা ভাবেই তারতম্য আছে, তথাপি ইহাদিগকে মোটামুটি রূপে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

১ম। বাহিরের কোনও শক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত আদর্শ। ইহাতে বাহিরের শক্তির ইচ্ছানুসারেই আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই শক্তিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধের অনুযায়ী হইয়া চলাই পুণ্য এবং না চলাই পাপ। পুণ্যের ফল সুখ, পাপের ফল দুঃখ।

২য়। অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা নির্দ্ধারিত আদর্শ। ইহাতে আমাদিগের নৈতিক আদর্শ বাহির হইতে আসে না। আমরা আত্মানুসন্ধান দ্বারাই জানিতে পারি, এই আদর্শটি কি। ভিতরের প্রেরণাই আমাদিগকে বলিয়া দেয় আমাদিগের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত ; পাপ কি, পুণ্য কি, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি।

যাঁহারা বাহিরের শক্তিকে, আমাদিগের নৈতিক আদর্শের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা (Divine will)। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা রাষ্ট্রের (political stateএর) ইচ্ছা। আবার কাহারো কাহারো মতে ইহা সমাজের ইচ্ছা।

ঈশ্বর কখনো কখন, তাঁহার ইচ্ছা ঋষি (Prophet)দিগের নিকট প্রকাশ করেন, এবং তাঁহারা আবার জনসাধারণের নিকট ইহা প্রচার করেন। এই ভাবে প্রকাশিত (revealed)

বিধি নিষেধ মানিয়া চলাই পুণ্য এবং না মানিয়া চলাই পাপ। ইহকালেই হউক বা পরকালেই হউক, পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। এই নীতিবাদের বিরুদ্ধে এই বলা হয় যে, ইহাতে আমরা নৈতিক জ্ঞানের একটা স্থায়ী সুদৃঢ় ভিত্তি পাই না। যাহা অনিয়ন্ত্রিত (arbitrary) ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্থায়িত্ব নাও থাকিতে পারে। ঈশ্বর এক সময়ে যাহা বিধি নিষেধ বলিয়া ধার্য্য করিয়া দিলেন, তাহা অন্য সময় পরিবর্ত্তন করিতেও পারেন। ঋষিদিগের মধ্যেও নীতি সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ নহে। আর বিশেষতঃ যে নীতি প্রলোভন এবং ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা বিষয় বুদ্ধি (prudence) হইতে পারে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর নীতি নহে।

রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায়, ইহার বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনই বলিয়া দেয় কোন কার্য্য করা উচিত, কোন কার্য্য করা উচিত না। কোন কার্য্য করিলে পুরস্কৃত হইব অর্থাৎ নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিব এবং কোন কার্য্য করিলে দণ্ডার্হ হইব। এই প্রকার নীতিবাদকে বলা হয় রাষ্ট্রীয় নীতিবাদ (jural theory)। এই নীতিবাদও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহাতেও নীতির কোনও মৌলিক স্থায়ীত্বের আভাস পাওয়া যায় না। কারণ সকল দেশের আইন এক ছাঁচে গঠিত বা এক মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই সকলের মধ্যেও কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় এবং ইহার উত্তরের জন্যও আর একটা আদর্শের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত

স্বাধীনতার দিকে ঝোঁক বেশি। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাধীনতার সংঘর্ষণ নিবারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, আইন দ্বারা কেবল ততটুকু মাত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্ব করা হয়। ইহার মূলনীতি হইল ব্যক্তিই আসল, ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই রাষ্ট্র।

এই মতের বিপরীত মতে রাষ্ট্রই আসল। রাষ্ট্র বা সমষ্টির মঙ্গলই, ইহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিয়ানক। রাষ্ট্রীয় উন্নতিই সমস্ত বিধি-নিষেধের লক্ষ্য। এই প্রকার বিরুদ্ধ আদর্শ হইতে রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধও ভিন্ন ভিন্ন রকমের, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের হইয়া দাঁড়ায়। আর এক কথা এই যে, অবস্থা অনুসারে একই রাষ্ট্রের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিধি-নিষেধ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ, কোনো স্থায়ী অপরিবর্ত্তনশীল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সুতরাং ইহাকে নৈতিক আদর্শ বলিয়া মানিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। আর এক কথা এই যে, আমরা রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া চলি পুরস্কারের লোভে বা দণ্ডের ভয়ে। যে নীতি এই প্রকার ভয় বা প্রলোভনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে উচ্চ শ্রেণীর নীতি বলা যায় না।

আর একটি বাহিরের শক্তি আছে, যাহা অনেক সময় আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ামক হইয়া থাকে। ইহা হইয়াছে সমাজ। প্রত্যেক সমাজেই, এইরূপ কতগুলি নিয়ম আছে, যাহা আমরা মানিয়া চলি। কোনোও কোনো নীতি-বাদী বলেন, এই সামাজিক বিধি-নিষেধ (Ethos)ই হওয়া উচিত আমাদিগের নৈতিক আদর্শ। আমরা সামাজিক বিধি-

নিষেধ মানিয়া চলি কেন? মানিয়া চলিলে লোকের নিকট প্রশংসার্হ, এবং না মানিয়া চলিলে নিন্দার্হ হই বলিয়া'ত? যদি তাহাই হইল, তবে এই স্থলেও নীতির নিয়ামক হইল প্রশংসার লোভ অথবা নিন্দার ভয়। সুতরাং এই সকলকেও নীতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। আর এক কথা এই যে, সমাজে সমাজেও এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে এত পার্থক্য থাকে যে, ইহাদিগের পশ্চাতে কোনও স্থায়ী সত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এই কথা সত্য যে, এই সকল বিধি-নিষেধ হইতে, কোন্ সমাজ নৈতিক ভাবে কতটা উন্নত তাহার একটা ধারণা করিতে পারা যায়।

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বাহিরের কোনও শক্তির ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুরস্কারের লোভে বা দণ্ডের ভয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা নৈতিকজীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে পারে না। সুতরাং নৈতিক বুদ্ধি কি, তাহার মাপকাঠিই বা কি এবং ইহার প্রেরণাই বা আসে কোথা হইতে, আমাদিগের ভিতরেই তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে।

দার্শনিক ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের সকলের মধ্যেই নৈতিক বৃত্তি (moral faculty) আছে। ইহা হইল বিবেক (conscience)। এই বিবেকই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, আমাদিগের কর্ত্তব্যই বা কি এবং অকর্ত্তব্যই বা কি? সর্ব্বথা অন্য নিরপেক্ষ হইয়া বিনা দ্বিধায় বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করাই প্রকৃষ্ট নীতি। এই নীতির কথা এই যে কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য করিতে হইবে—ফলাফল যাহাই হউক না কেন।

এই নীতি পালনের মধ্যে অন্য কোনও বিচারবুদ্ধি থাকিবে না। ক্যাণ্ট এই বিবেকের প্রেরণার নাম দিয়াছেন categorical imperative। সর্ব্বপ্রকার অন্য প্রেরণা নিরপেক্ষ হইয়া বিবেকের প্রেরণানুযায়ী কর্ত্তব্য নিরুপণ করা দ্বারা কি বুঝা যায়, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ক্যাণ্ট একটি পরিষ্কার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া কোনো পীড়িত ব্যক্তির সেবা করে, বা দরিদ্রকে সাহায্য করে, তাহার কার্য্য ভাল হইলেও ইহা নৈতিককার্য্য নহে। যদি কোনো ব্যক্তি বিবেকের প্রেরণায় পীড়িতের সেবা করা কর্ত্তব্য বোধ করে এবং এই কর্ত্তব্য বোধের বশীভূত হইয়া তাহা করে, তবে তাহার কার্য্য নৈতিককার্য্য। ভিতর হইতে যে প্রেরণা আসে, সর্ব্বপ্রকার অন্য প্রেরণা-নিরপেক্ষ হইয়া তাহা করাই নৈতিককার্য্য। ইহার মূলমন্ত্রই হইল কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য করিবে। ক্যাণ্ট্ বলেন ঃ—

A good will which acts in conformity to rational law out of pure regard for it, is the only thing that is good in and for itself. It has absolute worth, wholly regardless of what it accomplishes and how it succeeds in the world.

এই নীতিবাদ, অনেকটা আমাদিগের গীতোক্ত কর্ম্মযোগ-মূলক নীতিবাদের ন্যায়। গীতাতে এই নীতিকে বলা হইয়াছে— নিষ্কামকর্ম্ম অর্থাৎ ফলাফলে সমচিত্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যের জন্যই

কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা। এই নীতিতে কর্ত্তব্যবোধ ব্যতীত অন্য কোনও বোধের—দয়াই হউক বা ভালবাসাই হউক, বা অন্য কোনোও মানসিক প্রেরণাই হউক—স্থান নাই বলিয়া, ইহাকে বলা হয় নিষ্কামকর্ত্তব্যবাদ (Rigourism)।

এই নীতিবাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, এই নীতি অনুসরণ করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার সংবেদনা (sensibility, passion and desire), অর্থাৎ এই নীতি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ব্যতীত, সর্ব্বপ্রকার মানসিক প্রেরণাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তাহাত সম্ভবপর নয়—অন্ততঃ গৃহীর পক্ষেত নয়ই। যদি কেহ এই নীতি অনুসরণ করিতে পারে, তবে হয়ত, কেবল সন্ন্যাসী (cynics) দিগের দ্বারাই তাহা সম্ভব। সুতরাং ইহার কাল্পনিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহার কার্য্যকরি মূল্য অতি সামান্য। গীতার নিষ্কামকর্ম্মের বিরুদ্ধেও এই আপত্তি উত্থাপিত হয়। কিন্তু গীতাতেই ইহার উত্তর আছে। গীতাতেই বলা হইয়াছে যে, কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে করার অর্থ এই নহে যে, ইহাতে কোনোও কামনা থাকিবে না। ইহাত হইতেই পারে না। নিষ্কামকর্ম্মের অর্থ এই যে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহা করিতেই হইবে ফলাফল যাহাই হউক না কেন। ফলাফলে সমচিত্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাই নিষ্কামকর্ম্ম। আমার মনে হয় ক্যাণ্টের নীতিবাদ (Rigourism) ও কতকটা এইরূপ। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমাদিগের মনের কোমলবৃত্তি সকল, যেমন দয়া, ভালবাসা, পরোপকার প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে

নির্ম্মল করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, যদি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বিরুদ্ধে এই সকল দাঁড়ায় তবে ইহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম অর্থাৎ বিবেকাদিষ্ট কর্ম্ম করিতেই হইবে।

পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। বিবেকের আদেশ আর ঈশ্বরের আদেশত একই। Voice of conscience is the voice of God. যদি তাহাই হয়, তবে এই নীতি-বাদের সহিত প্রথমোক্ত অর্থাৎ Revelation মূলক নীতি-বাদের পার্থক্য রহিল কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই দুই মতের মধ্যে পার্থক্য আছে—বেশ বড় রকমেরই পার্থক্য আছে। এই নীতির মাপকাঠি হইয়াছে কর্ম্মকর্ত্তার নিজের ভিতরের প্রেরণা, অপরটির মাপকাঠি হইয়াছে অন্যের অর্থাৎ ঋষিদিগের বাক্যের উপর বিশ্বাস। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আকাশ পাতাল।

ইংরেজীতে conscience কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয় বর্ত্তমানে আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় বিবেক কথাটিও সেই অর্থে ব্যবহার হয়। সেই জন্য আমরাও বিবেক কথাটি এই স্থানে সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম। আমাদিগের দার্শনিক ভাষায় বিবেক কথাটির অর্থ আত্মানাত্মা জ্ঞান এবং এই গ্রন্থে বিবেক কথাটির স্থানে স্থানে এই অর্থেও ব্যবহার করা হইয়াছে। কোন অর্থে কথাটি কোন স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

আর এক শ্রেণীর নীতিবাদী আছেন, যাঁহারা বলেন যে, আমরা আত্মানুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারি যে, আমরা সকলেই

চাই সুখলাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তি। সুখলাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যে নীতি অনুসরণ করিলে সুখ-লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত নীতি। এই শ্রেণীর নীতিবাদীদিগকে বলা হয় সুখবাদী। (hedonists) তাঁহাদিগের মতের নাম সুখবাদ (hedonism)।

সুখবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, আমরা যে কোনো কাজই করি না কেন, সকলেরই লক্ষ্য হইয়াছে সুখলাভ। যদি আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে, সুখলাভের প্রেরণা থাকে তবে আমাদিগের কার্য্যের মধ্যে আর ঔচিত্যানুচিত্যের কথা আসে না। সুতরাং নীতির কথাও আসে না। তবে যদি এইরূপ বলা হয় যে, যদিও আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যই সুখলাভের প্রেরণামূলক, তথাপি এই কথা বলা যায় না যে, প্রত্যেক কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখলাভের প্রেরণামূলক ; সুতরাং যদি আমাদের লক্ষ্য হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখলাভ (greatest pleasure and happiness), তবে এই-রূপ বলা যাইতে পারে যে, যে কার্য্য দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখলাভ হয়, সেই কার্য্যই কর্ত্তব্য এবং যাহা দ্বারা ইহার ব্যাঘাত হয় তাহাই অকর্ত্তব্য। এই ভাবে দেখিতে গেলে, আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে সুখলাভের প্রেরণা থাকিলেও ইহাতে নীতির কথা আসিতে পারে।

অন্য এক শ্রেণীর সুখবাদী আছেন, যাঁহারা বলেন আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই যে সুখলাভের ইচ্ছার প্রেরণা হইতে হইয়া

থাকে, তাহা নহে; সুখই হওয়া উচিত আমাদিগের কাম্য। যে কার্য্য দ্বারা সুখলাভ হয় তাহাই নৈতিক কার্য্য এবং যে কার্য্য ইহার ব্যাঘাত জন্মায় তাহাই নীতি-বিগর্হিত কার্য্য।

নৈতিক সুখবাদও দুই রকমের। ব্যক্তিগত সুখবাদ (egoistic hedonism) এবং সমাজগত সুখবাদ (altruistic hedonism)। ব্যক্তিগত সুখবাদীর লক্ষ্য হইল নিজের সুখ এবং সমাজগত সুখবাদীর লক্ষ্য হইল সমাজের অধিকাংশ লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ (greatest happiness of the greatest number)।

মার্জ্জিত (refined) এবং অমার্জ্জিত (unrefined) ভেদেও সুখ দুই রকমের। কেবল বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সংযোগ দ্বারা যে সুখ (pleasure) হয় তাহা অমার্জ্জিত সুখ। এবং পরোপকার, জ্ঞান উপার্জ্জন, জীবে দয়া এবং প্রেম প্রভৃতি দ্বারা যে মানসিক সুখ হয় তাহা মার্জ্জিত সুখ।

কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন, সুখের পরিমাণ অপেক্ষা গুণই হওয়া উচিত অধিক আদরণীয়। ব্যক্তিগত সুখবাদী প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রটেগোরাস্ বলেন, প্রকৃত সুখই হওয়া উচিত আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য। প্রকৃত সুখ কি? প্রভুত্ব করা—নিজের এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করাই প্রকৃত সুখ। নিজের উপর প্রভুত্ব করিবার একমাত্র উপায় ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার উপায় সুচিন্তিত ভাব, এবং ইহা সুন্দর বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা। সুতরাং সুখবাদীর

নীতি হওয়া উচিত ইন্দ্রিয় সংযম এবং বাগ্মিতা (self control anb rhetoric).

সুখবাদী দার্শনিক এপিকিউরাসের মত আরও সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, সুখই আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রকৃত সুখ কিসে হয় তাহা জানা উচিত। প্রকৃত সুখ যাহা, তাহা হওয়া উচিত স্থায়ী সুখ। ইন্দ্রিয়সুখ স্থায়ী সুখ নহে। ইহা ক্ষণস্থায়ী। শান্তি এবং পরিতৃপ্তি বোধই প্রকৃত সুখ। মনের আনন্দই প্রকৃত. আনন্দ। ইন্দ্রিয় ভোগ দ্বারা ইহা হয় না। আমাদিগের প্রত্যেক বিষয়েই সংযত হওয়া উচিত। সংযত ইন্দ্রিয় দুঃখ হইতে রক্ষা করে। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের দুঃখ বোধও প্রকৃত সুখের কারণ হয়, যেমন অস্ত্রোপচার দ্বারা রোগ আরোগ্য করা। তবেই দেখা যায় যে, এমন যে প্রসিদ্ধ সুখবাদী এপিকিউরাস্ তিনিও মার্জ্জিত সুখকেই প্রকৃত সুখ মনে করিতেন। এমন কি, ইন্দ্রিয় সুখকেও উপেক্ষা করিয়াও যদি ইহা লাভ হয়, তবুও ইহা ভাল। সুখের পরিমাণ (quantity) অপেক্ষা গুণই (quality) অধিক কাম্য। ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা ইহা লাভ হয়। ইন্দ্রিয় সংযমই প্রকৃত নৈতিক কার্য্য।

বলা হইয়াছে যে, কোনো কোনো দার্শনিকের মতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সুখই হওয়া উচিত সুখের মাপকাঠি। প্রসিদ্ধ নীতিবিদ মিল এবং বেন্থাম্ এই শ্রেণীর নীতিবাদী। তাঁহাদিগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মিলের মতে সুখের গুণ এবং বেন্থামের মতে, ইহার পরিমাণ হওয়া উচিত, সুখ মাপিবার মাপ কাঠি। অথবা অল্পকথায়, এক জনের

মতে মার্জ্জিত সুখ এবং অপর জনের মতে মার্জ্জিত এবং অমার্জ্জিত উভয়ের যোগফলই হওয়া উচিত সুখের মাপকাঠি। মিল তাঁহার মতটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পরিতৃপ্ত নির্ব্বোধ হইতে অপরিতৃপ্ত সক্রেটিস্ হওয়া অনেক ভাল। পরিতৃপ্ত শূকর হইতে অপরিতৃপ্ত মানুষ হওয়া ভাল। হয়ত নির্ব্বোধ এবং শূকর এই কথা স্বীকার কবিবে না, কেন না তাহারা নিজের অবস্থা ব্যতীত অপর পক্ষের কথা কিছু জানে না। কিন্তু অপর পক্ষ উভয় পক্ষের অবস্থাই জানে।

(It is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied, better to be a man dissatisfied than a pig satisfied. And if the fool or the pig is of different opinion, it is because, they only know their own side of the question, The other party to comparison knows both sides.)

সুখও যে গুণানুসারে নানাভাবে বিভাগ করা যায়, ভারতীয় নীতিবাদেও ইহার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। গীতাতে সুখকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। যে সুখ, আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ অর্থাৎ যাহা আত্মপ্রসাদ বা শান্তি জন্য, যাহা লাভ করা, অগ্রে কষ্টসাধ্য হইলেও পরিণামে সুখকর তাহাই সাত্ত্বিক বা শ্রেষ্ঠ সুখ। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চরিতার্থজন্য যে সুখ

তাহা রাজসিক সুখ, ইহা সাত্ত্বিক সুখ হইতে নিকৃষ্ট ; এবং মোহ, আলস্য, নিদ্রাজন্য যে সুখ তাহা তামসিক সুখ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সুখ। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় নীতিবাদীদিগের মতেও জ্ঞানজন্য যে সুখ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ। মিলও Socrates dissatisfied is happier than a fool satisfied কথাটি দ্বারা, জ্ঞান জন্য সুখই লক্ষ্য করিয়াছেন।

আর এক প্রকার নীতিবাদ আছে, যাহাতে বলা হয় যে, আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবনকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইয়া ইহাকে পূর্ণ করা (perfect)—জীবনে আদর্শ মানবতাকে প্রতিফলিত করা—যে অবস্থা লাভ করিলে কোনো প্রকার পাপাচরণের সম্ভাবনাই থাকে না, অপরোক্ষ ভাবেই আত্মানুভূতি (self realisation) লাভ হয় সেই অবস্থা লাভ করা। জীবনের পূর্ণতম অবস্থা হইয়াছে, অপরোক্ষ ভাবে আত্মানুভূতির (self-realisationএর) অবস্থা। যে কার্য্য করিলে ঐ অবস্থালাভ হয় তাহাই পুণ্য এবং যাহাতে ইহার ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাই পাপ। এই মতের নাম পূর্ণত্ববাদ (perfectionism)। এই মতে পূর্ণতা লাভের জন্যই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। ইহাই পুরুষার্থ। এই মতে একটু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া কোনোও কোনো নীতিবাদী মনে করেন যে পূর্ণতা লাভের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের পূর্ণতা জন্য যে শান্তি বা আনন্দ তাহার প্রতিও লক্ষ্য থাকে। এমন কি আমরা লক্ষ্যে পহুছিবার জন্য

কতটা অগ্রসর হইতেছি এই আনন্দ বা শান্তির অনুভূতিই হইবে তাহার মাপকাঠি। এই প্রকার নীতিবাদকে বলা হয় হিতবাদ (Eudaemonism)। পূর্ণত্ববাদ এবং হিতবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ণত্ববাদে আমাদিগের লক্ষ্য বা নৈতিক আদর্শ হইবে পূর্ণতা লাভ করা। পূর্ণতা জন্য শান্তি বা আনন্দ ইহার ফল। ইহা আদর্শের অংশ নহে। হিতবাদে, পূর্ণত্ব এবং পূর্ণত্বজন্য শান্তি বা আনন্দ উভয়ই লক্ষ্য বা আদর্শের অংশ।

এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় দার্শনিকদিগের মতেও, পূর্ণত্বই নৈতিক জীবনের আদর্শ। পূর্ণত্ব বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন. এমন একটা অবস্থা, যাহা লাভ হইলে আর কোনো অভাব বোধ থাকে না। অভাব বোধ থাকাই অপূর্ণত্ব ; ইহা না থাকাই,—উপনিষদের ভাষায় পর্য্যাপ্তকাম হইয়াই পূর্ণত্ব। পর্য্যাপ্তকাম হইতে পারিলে, এমন একটা শান্তি বা আনন্দের অবস্থা লাভ হয় যে, তখন আর অন্য কিছু কাম্য বস্তু আছে বলিয়া মনে হয় না। গীতার ভাষায় "যং লব্ধা, চাপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ" বলিতে যে অবস্থা বোঝায় ইহা তাহাই। যাহা কিছু এই পূর্ণত্ব লাভের সাহায্য-কারী তাহাই পূণ্য এবং যাহা কিছু বিঘ্নকারী তাহাই পাপ। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বের বা আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতিই পূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায়। তত্ত্ব-জ্ঞানই পুণ্য এবং অজ্ঞতাই পাপ। তত্ত্বজ্ঞান হইল পূর্ণত্ব

লাভের উপায়—পরা শান্তি বা অনাবিল চির আনন্দ ইহার ফল।

কোনোও কোনো দার্শনিকের মতে জগতে সুখ বলিয়া কোনো ভাবাত্মক বস্তু নাই। যাহা আছে তাহা কেবল দুঃখ। দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টাই হওয়া উচিত নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। সাংখ্য সূত্রের আরম্ভেতেই বলা হইয়াছে 'আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পুরুষার্থ'। দুঃখের মূল উৎপাটনের চেষ্টাই পুরুষার্থ। জন্ম হইলেই যখন দুঃখ লাভ করিতে হয়, তখন জন্ম নিরোধ করিতে পারিলেই দুঃখেরও নিরোধ হয়। বাসনাই জন্মের কারণ। বাসনার নিরসন করা অর্থাৎ পর্য্যাপ্তকাম হওয়াই জন্ম নিরোধ করিবার উপায়। এই মতেও তত্ত্বজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত কাম হইবার উপায়। তাহা হইল এই দাঁড়াইল যে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয় বাসনা নিবৃত্তি, বাসনার নিবৃত্তি দ্বারা হয় পূর্ণতা লাভ এবং পূর্ণতা লাভ দ্বারা হয় জন্ম নিরোধ এবং জন্ম নিরোধ দ্বারা হয় দুঃখ নিবৃত্তি বা পরাশান্তি লাভ। যাহা কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাহায্যকারী তাহাই পুণ্য এবং যাহা কিছু ইহার বিঘ্নকারী তাহাই পাপ।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য কতগুলি সাধনা (moral discipline) ও, তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল হইয়াছে বিবেক. বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষা উপরতি মুমুক্ষুতা এবং সমাধি। এই সকল অনুসরণ করাই পুণ্য; বিপরীত আচরণই পাপ।

বিষয়টি আর এক ভাবেও বিচার করা হইয়াছে। পূর্ণতা লাভই সকল সাধনার লক্ষ্য। ঈশ্বর পূর্ণ; সুতরাং ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া জীবন গঠন করাই—শাস্ত্রীয় ভাষায় ব্রহ্মভূত হওয়াই পূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায়। ব্রহ্ম সকলের প্রতি সমদর্শী এবং নির্ব্বিকার। সুতরাং পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও সমদর্শী এবং নির্ব্বিকার হইতে হইবে। সকলকে নিজের মত মনে করিতে হইবে। বাস্তবিক সর্ব্বভূতে সমদর্শন অর্থাৎ সকলকে নিজের ন্যায় দেখা, ভারতীয় প্রাচীন নীতিবাদী-দিগের মতে, একটি উৎকৃষ্ট এমন কি উৎকৃষ্টতম নৈতিক আচরণ। এই একটি নীতি অনুসরণ করিলে পূর্ণত্ব লাভের জন্য সকল নীতিই অনুষ্ঠিত হয়। আস্তিক নীতিবাদীই হউক বা বৌদ্ধ নীতিবাদীই হউক সকলের মতেই "আত্মোপম্যেন" অর্থাৎ নিজের ন্যায় সকলকে দেখাই হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নীতি। উপনিষদে আছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি।
সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন সর্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাভু দ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

বৌদ্ধদিগের নীতি এবং এই নীতির মধ্যে পার্থক্য নাই। তাঁহাদিগের মতে ধর্ম্মের মধ্যে চারিটি আর্য্য সত্য শ্রেষ্ঠ। এই চারিটি হইয়াছে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস এবং দুঃখধ্বংসের উপায়, এই চারিটি বিষয়ের জ্ঞান।

জগতে সুখ বলিয়া কিছু নাই। যাহা আছে তাহা দুঃখ। জন্ম হইলেই দুঃখের হাতে পড়িতে হয়। সুতরাং জন্ম নিরোধই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। বাসনাই জন্মের কারণ। বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভের পর বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, "হে গৃহনির্ম্মাতা তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি আর তোমার মোহে পড়িবনা"। বাসনা নিবৃত্তি আর পর্য্যাপ্তকাম হওয়া একই কথা। সুতরাং বৌদ্ধ নীতিবাদেরও লক্ষ্য, দুঃখ নিবৃত্তি, এবং ইহার উপায় পূর্ণতালাভ বা পর্য্যাপ্তকাম হওয়া।

যে সকল সাধনা (moral discipline) দ্বারা বৌদ্ধেরা বাসনা নিবৃত্তির চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে তাঁহারা বলেন অষ্টাঙ্গমার্গ। ইহার আর এক নাম মধ্যপথ, মধ্যপথ এইজন্য যে ইহাতে সন্ন্যাসের ন্যায় কঠোর তপস্যা নাই এবং ভোগ্য-বিষয়েও অসংযততাও নাই। বৌদ্ধদিগের ভাষায়, এই অষ্টাঙ্গের নাম সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। এই সকলের অনুসরণই পুণ্য, ইহাদিগের বিপরীত আচরণই পাপ। বৌদ্ধধর্ম্ম, জ্ঞানের ধর্ম্ম, সুতরাং তত্ত্ববিচার এবং ধ্যান যে, বৌদ্ধ সাধনার প্রধান অঙ্গ তাহা বলাই বাহুল্য। তাই সাধককে আরম্ভেতেই বিচারপূর্ব্বক নিত্যানিত্য, সার অসার, পদার্থনিচয়ের কার্য্য-কারণপ্রবাহ নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি দ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু নিরূপণপূর্ব্বক নিত্য বস্তু লাভের এবং অনিত্য বস্তু ত্যাগের সঙ্কল্পকে বলে সম্যক সঙ্কল্প। সম্যক

এবং সম্যক সঙ্কল্পের অনুযায়ী বাক্য এবং কর্ম্ম সংযত করাকে যথাক্রমে বলে, সম্যকবাক এবং সম্যককর্ম্ম। সম্যক দৃষ্টি অনুযায়ী আহারাদি সংযত করিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করা সম্যক আজীব। সম্যক দৃষ্টি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া জানা যায় এবং যাহা করিতে সঙ্কল্প করা যায়, তদ্‌বিষয়ে উদ্যমশীল হওয়াই সম্যক ব্যায়াম। সম্যক দৃষ্টি দ্বারা যাহা নিত্য সত্য বলিয়া জানা যায়, তাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখার নাম সম্যক স্মৃতি। সম্যক দৃষ্টি দ্বারা যাহা নিত্য সত্য বলিয়া জানা যায়, তাহার প্রতি চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক ধ্যান বা সমাধি।

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে, একখানা বৃহৎ আকারের গ্রন্থই লিখা হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে যাহা বলা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে ভারতীয় নীতিবাদীদিগেরও নৈতিক আদর্শ ছিল পূর্ণতা লাভ বা পর্য্যাপ্ত-কাম হওয়া। কিন্তু এই আদর্শের অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্ব লাভ জন্য পরাশান্তি বা পরমানন্দের প্রতিও লক্ষ্য থাকে। সুতরাং এই নীতিবাদকেও পাশ্চাত্য নীতিবাদীদিগের ভাষায় হিতবাদ বা Eudæmonism বলা যাইতে পারে। পরাশান্তি কথাটির নানা নাম আছে, যথা—মোক্ষ, নির্ব্বাণ, নিশ্রেয়স ইত্যাদি।

আর একপ্রকার নীতিবাদ আছে, যাহাতে বলা হয় যে, সৌন্দর্য্যের জ্ঞানই আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মাপকাটি। যাহা কিছু সুন্দর তাহাই ভাল, যাহা কিছু কুৎসিত তাহাই মন্দ। সুন্দর বাক্য, সুন্দর চরিত্র, সুন্দর ব্যবহার এই সকলই

হওয়া উচিত ভাল মন্দ বিচারের মাপকাটি। ঈশ্বর সুন্দর, সুতরাং যাহাকিছু সুন্দর তাহাতেই তাঁহার ছাপ রহিয়াছে। গীতাতে একটি কথা আছে—যাহা শ্রীমৎ, তাহাতেই ভগবান আছেন। 'শ্রী' শব্দের অর্থই হইয়াছে সুন্দর। উপনিষদেও যাহা কাম্য এবং শান্তিপ্রদ, তাহাকে শ্রেয় বলা হইয়াছে, এমন কি মোক্ষকেও শ্রেয়স্ বা নিশ্রেয়স্ বলা হইয়াছে।

আর একপ্রকার নীতিবাদ আছে, যাহাতে বলা হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নীতি, আদিকাল হইতেই স্থির হইয়া আছে। সম্বন্ধের জ্ঞান ঠিক থাকিলে তদনুযায়ী নৈতিক ব্যবহারের জ্ঞান আমরা ভিতর হইতেই (intuitively) জানিতে পারি। ইহার জন্য অন্য কোনও আদর্শ বা বাহিরের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। দুই জনের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ, এই জ্ঞান থাকিলে, পিতা তাঁহার ভিতর হইতেই জানিতে পারেন, পুত্রের প্রতি তাঁহার কি কর্ত্তব্য এবং পুত্রও তাহার ভিতর হইতে জানিতে পারে পিতার প্রতি তাহার কি কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধানুযায়ী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনাদিকাল হইতেই স্থির হইয়া আছে এবং আমরা ভিতর হইতে তাহা জানিতে পারি।

যদি তাহাই হয় তবে আমাদিগের কর্ত্তব্য হইল সম্বন্ধ নিরূপণ করা। সম্বন্ধের জ্ঞান ঠিক হইলে নৈতিকজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হইয়া যায়; কেননা, আমরা ভিতর হইতেই (intuitively) তাহা জানিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এই সম্বন্ধ জ্ঞান দ্বারা, যদি তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তার সহিত

আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহাও লক্ষিত হয় তবে এই নীতিবাদও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

দর্শনের ব্যাপক অর্থে অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায়, নীতি-বিজ্ঞানও দর্শনের একটী শাখা। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে দর্শনের সঙ্গে নীতি-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ইহা অপেক্ষাও ঘনিষ্টতর। নৈতিক আদর্শ নিরূপণের জন্য পারমার্থিক সত্তার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ কি, আমাদিগের ইচ্ছা করা না করার স্বাধীনতা আছে কিনা, ইহা পূর্ব্বে জানা থাকা প্রয়োজন; কারণ, এই সকল দার্শনিক জ্ঞানই নৈতিক আদর্শের ভিত্তি। পারমার্থিক তত্ত্ব কি, বা কি কি, ইহা জানা না থাকিলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণা চলিতে কোনো বাধা নাই। দেশ ও কালের জ্ঞান আমাদিগের প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ (a posteriori) না প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ (a priori) ইহা জানা না থাকিলেও গণিত-বিজ্ঞানের গবেষণা চলিতে পারে। কিন্তু নীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং দার্শনিক জ্ঞানের সহিত নৈতিকজ্ঞানের সম্বন্ধ যে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্টতর ইহা সুস্পষ্ট।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক মত এক ভাবে না একভাবে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ জড়তান্ত্রিক দার্শনিকগণ সুখবাদী (hedonists) জড়-তান্ত্রিকদিগের মতে, আত্মা বলিয়া কোনোও স্থায়ী সত্তা নাই; ইহা মস্তিষ্কের কার্য্য, একটা চৈতন্য

প্রবাহ মাত্র, শরীরের সঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যায়। যাঁহাদিগের দার্শনিক মত এই, তাঁহাদিগের নীতি ত "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" হবেই, সেই সুখ মার্জ্জিত মানসিক সুখই হউক, বা অমার্জ্জিত ইন্দ্রিয় ব্যাপার জন্য সুখই হউক, ব্যক্তিগত সুখই হউক বা সমাজগত সুখই হউক।

ক্যাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদিগের মতে ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ, ইহারা সকলই পারমার্থিক সত্তা। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারে পুণ্যও করিতে পারে। ঈশ্বর পাপের জন্য শাস্তি বিধান করেন এবং পুণ্যের জন্য পুরস্কার বিধান করেন। এই দার্শনিক মতের অনুযায়ী নীতিবাদকে rigourism হইতেই হইবে। যে ঈশ্বর আমাদিগকে পাপের জন্য শাস্তি এবং পুণ্যের জন্য পুরস্কৃত করিবেন, বিবেক দ্বারা প্রেরিত তাঁহার আদেশ, সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ হইয়া প্রতিপালন করা যে আমাদিগের নৈতিক জ্ঞানের আদর্শ হইবে, তাহাত বলাই বাহুল্য।

জ্ঞানতান্ত্রিক দার্শনিকদিকদিগের মতে আমাদিগের আত্মা একভাবে না একভাবে জ্ঞান স্বরূপ পারমার্থিক সত্তার বিকাশ বা অংশ। ইহা অমর। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতিই ইহার পতন, এবং পুনর্মিলনই ইহার লক্ষ্য। সুতরাং এই মতানুযায়ী নীতিবাদের আদর্শও হইবে পূর্ণতা বা perfectionism। কারণ, ঈশ্বরের আদর্শে পূর্ণ বা ব্রহ্মভূত না হইতে পালি পুনর্ম্মিলন এবং তজ্জনিত চির আনন্দলাভের আর অন্য কোনও উপায় নাই।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সুখবাদই হউক, বা নিষ্কাম কর্ত্তব্যবাদ (rigourism)ই হউক বা পূর্ণত্ববাদ (Perfectionism)ই হউক, সকলেরই মূলে রহিয়াছে তদনুযায়ী দার্শনিক জ্ঞান। এমন কি সৌন্দর্য্যবাদ এবং সম্বন্ধজ্ঞানমূলকনীতিবাদের মূল অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে যে, ইহারাও দার্শনিক জ্ঞানমূলক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্যবাদীদিগের কথা এই যে, যাহা কিছু সুন্দর তাহাই ঐশ্বরিক, যাহা কিছু কুৎসিত তাহাই অনৈশ্বরিক-পাপমূলক। ঈশ্বর স্বয়ং সুন্দর, সকল সৌন্দর্য্যের আকর। ভালবাসা সুন্দর, কারণ, ইহা ঐশ্বরিক, ইহা পুণ্য। দ্বেষ, কুৎসিত, ইহা অনৈশ্বরিক, ইহা পাপ। শান্তাবস্থা সুন্দর, ইহা ঐশ্বরিক, অধৈর্য্যাবস্থা কুৎসিত, ইহা অনৈশ্বরিক এবং পাপ। এই মতে, সৌন্দর্য্য বোধ হইতেই আমরা পাপ পুণ্যের মাপকাঠি নিরূপন করিতে পারি। যাহা কিছু সুন্দর তাহা ঐশ্বরিক, যাহা "শিবম্ তাহা সুন্দরম্"। যাহা কিছু শ্রীমৎ তাহাতেই ঈশ্বর আছেন, ইহাওত একটা দার্শনিক মতই। সুতরাং সৌন্দর্য্যবাদও দার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সম্বন্ধ জ্ঞানমূলক নীতিবাদীরা বলেন, সম্বন্ধের জ্ঞান ঠিক হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান আমরা ভিতর হইতেই (intuitively) জানিতে পারি। ইহারও গোড়াতে একটি দার্শনিক ভিত্তি রহিয়াছে। সম্বন্ধজ্ঞান বলিতে পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্মের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধের জ্ঞানও লক্ষিত হইয়া থাকে।

পারমার্থিক সত্তা বা ব্রহ্মের (absoluteএর) সহিত আমাদিগের সম্বন্ধের জ্ঞানত দার্শদিক জ্ঞানই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই একটি সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ হইলে অন্য ছোট সম্বন্ধের জ্ঞানত আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ ইহার স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে, জগতের সকলের প্রতিই আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান, আমরা ভিতর হইতেই জানিতে পারি।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে নৈতিক জ্ঞানের ভিত্তি দার্শনিক জ্ঞান,—দার্শনিক জ্ঞানের উপরই নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত।

দর্শনের সহিত নীতি-বিজ্ঞানের এতটা ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও তাহাদিগের মধ্যে যে কোনোও পার্থক্য নাই, তাহা নহে। পারমার্থিক সত্তার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা দর্শন পাঠে অবগত হইতে পারি। ইহার বেশি আর কিছু জানিতে পারি না। কিন্তু সেই সম্বন্ধানুযায়ী আমাদিগের পুরুষার্থ কি, আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্যে পঁহুছিবার জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই বা কি, এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই হইল নীতি-বিজ্ঞানের শিক্ষার বিষয়। দার্শনিক জ্ঞানের কার্য্যকরী জ্ঞান হইল নৈতিক জ্ঞান। বিজ্ঞানের সহিত শিল্প-জ্ঞানের যে সম্বন্ধ, দর্শনের সহিত নীতি-বিজ্ঞানের সেই সম্বন্ধ। ইহা লক্ষ্য করিয়াই একজন নীতিবিদ বলিয়াছেন যে, নীতি-বিজ্ঞানের শিক্ষার বিষয় হইয়াছে চরিত্র গঠনের কৌশল (art of life); বৌদ্ধ দার্শনিকগণের

ভাষায়, তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে সম্যকদৃষ্টি এবং নৈতিক জ্ঞান সম্যক্ আজীব।

নীতি-বিজ্ঞান আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিলেও, ইহা আমাদিগকে কোনো কার্য্য করিতে বা না করিতে বাধ্য করিতে পারে না। এই জন্য নীতি-বিজ্ঞানকে বলা হয় চরিত্রের নিয়ামক বিজ্ঞান (normative or regulative science),

নীতি-বিজ্ঞানের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রকরণের বিষয় নহে। দার্শনিক জ্ঞানের সহিত নৈতিক জ্ঞানের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য নীতি সম্বন্ধে যে কয়টি কথার মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কেবল তাহারই অল্পকথায় যথা সম্ভব আভাস দেওয়া হইল মাত্র। নীতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কেবল নীতি (ethics)ই, যে সকল গ্রন্থের আলোচনার বিষয়, সেইরূপ কোনোও গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

দর্শন এবং ধর্ম্ম

দার্শনিক হেগেল বলেন, দর্শন এবং ধর্ম্ম উভয়েরই আধেয় এক, কেবল আধার ভিন্ন। (Religion and philosophy have the same contents, only the containers are different)। এই কথা সত্য কিনা তাহার বিচার করিতে হইলে, আমাদিগের দর্শন সম্বন্ধে ধারণা যেরূপ সুস্পষ্ট

থাকা উচিত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণাও সেইরূপ সুস্পষ্ট থাকা উচিত।

ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে তাহা। এই অর্থে অদ্বৈতবাদীদিগের পারমার্থিক তত্ত্বই ধর্ম্ম। হেগেল যদি ধর্ম্ম বলিতে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং দর্শন বলিতে অতৈবাদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন তবে ত তাঁহার কথা ঠিকই।

কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ ইহা হইলেও সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিতে ইহা লক্ষিত হয় না। ধর্ম্ম শব্দেয় সাধারণ অর্থে, ইহার জন্য কয়েকটি বিশ্বাস অপরিহার্য্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, আমাদিগের আত্মার অমরত্বে এবং নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস, সকল ধর্ম্মেরই গোড়ার কথা। এ ছাড়া আরোও এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আমরা ইচ্ছা করিলে পাপ করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে পুণ্যও করিতে পারি। ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, পুণ্যের ফল সুখ পাপের ফল দুঃখ, এবং ঈশ্বর এই সুখ-দুঃখের বিধানকর্ত্তা।

দর্শনের মধ্যে যেমন অদ্বৈতবাদ এবং বহুসত্তাবাদ আছে, ধর্ম্মের মধ্যেও তেমন এক-ঈশ্বরবাদ, দুই-ঈশ্বরবাদ, এবং বহু-ঈশ্বরবাদ আছে। সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন যুগের গ্রীকগণ এবং ভারতীয় বৈদিক আর্য্যগণ ছিলেন বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বর্ত্তমানে পারসিকগণ ব্যতীত আর সকল সুসভ্য সম্প্রদায়ই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। পারসিকগণ দুই

ঈশ্বরে বিশ্বাসী। দার্শনিক মতের মধ্যে যেমন অদ্বৈতবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক আদরণীয়, তেমন ধর্ম্মের মধ্যেও এক-ঈশ্বরবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক আদরণীয় এবং দার্শনিকভাবে সমালোচনার যোগ্য।

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মসকলের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে তিন রকমের বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বিশ্বাসে, ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান, জড় ও জীব-জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। বিশ্ব একভাবে না একভাবে তাঁহারই অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় প্রকার বিশ্বাস বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং করুণাময়। জীবও তাঁহার ন্যায় পারমার্থিক। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান; জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান। ঈশ্বর হাতে পাওয়া উপাদানের সাহায্যে জগৎ রচনা করিয়া, তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি আমাদিগের পাপ পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারের বিধানকর্ত্তা। তৃতীয় প্রকার বিশ্বাসেও, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং করুণাময়। কিন্তু তিনি জগতের উপাদান-কারণ নহেন; জীবও পারমার্থিক সত্তা নহে। তিনি অবস্তু হইতে (Exnihilo) জীব ও জড় উপাদান সৃষ্টি করিয়া, তদ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন এবং ইহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি পাপ পুণ্যের শাস্তি এবং পুরস্কারের বিধানকর্ত্তা।

প্রথম প্রকারের এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মমত সকলকে এক-ঈশ্বরবাদ না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয় সর্ব্বেশ্বরবাদ

(Pantheism)। মোটের উপর, ভারতীয় এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক প্রায় সকল ধর্ম্মমতই সর্ব্বেশ্বরবাদ। এমন কি গোড়াতে শাক্ত ধর্ম্মমতও সর্ব্বেশ্বরবাদ। আমরা দেখিয়াছি যে, যে সকল অদ্বৈত মতে পারমার্থিক সত্তাকে এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সত্তা মনে করে, তাহারাও ইহাকে শক্তিবর্জ্জিত সত্তা মনে করে না। শক্তি এবং জ্ঞান, একই পারমার্থিক সত্তার দুইটি দিক (aspects) মাত্র। আমরা ইহাকে সর্ব্বশক্তিমৎ জ্ঞানও বলিতে পারি, সর্ব্বজ্ঞা শক্তিও বলিতে পারি। যাহাদিগের ধর্ম্মমতে, ইহার জ্ঞানের উপর ঝোঁক বেশী, তাহারা বলে, ইহা এক শক্তিশালী জ্ঞান; এবং যাহাদিগের ধর্ম্মমতে, ইহার শক্তির উপর ঝোঁক বেশী, তাহারা বলে ইহা এক জ্ঞান-শালিনী শক্তি। শক্তিমৎ জ্ঞানের উপাসকগণ তাহাদিগের উপাস্যকে বলে ভগবান বা পরমেশ্বর, এবং জ্ঞানশালিনী শক্তির উপাসকগণ তাহাদিগের উপাস্যকে বলে ভগবতী বা পরমেশ্বরী। ভগবানের উপাসকই হউক বা ভগবতীর উপাসকই হউক সকলের মতেই, এই উপাস্য, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ উভয়ই। সকলের মতেই, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সুতরাং তাহারা সকলেই সর্ব্বেশ্বরবাদী।

অদ্বৈতবাদী দার্শনিককে যদি তাঁহার ধর্ম্মমত এবং দার্শনিক মতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, তবে তাহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদী হইতেই হইবে। হেগেল ছিলেন অদ্বৈত-বাদী দার্শনিক। যদি তিনি, দর্শন বলিতে অদ্বৈতবাদ এবং ধর্ম্ম বলিতে সর্ব্বেশ্বরবাদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন,

তবে তিনি যে বলেন ধর্ম্ম এবং দর্শনের আধেয় এক, কেবল আধার ভিন্ন, এই কথা যে সত্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ব্বেশ্বরবাদীর ঈশ্বর এবং অদ্বৈতবাদীর পারমার্থিক তত্ত্ব ত একই সত্তা। সুতরাং আধেয় একই হইল। পার্থক্য কেবল আধারে। একের আধার যুক্তি এবং অপরের আধার বিশ্বাস। তবে, হেগেল ধর্ম্ম বলিতে সর্ব্বেশ্বরবাদ লক্ষ্য করিয়াছেন, কি বাইবেলের ধর্ম্মমতসকল (dogmas) লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা বিবেচনার বিষয়।

হেগেল তাঁহার বিতর্কের প্রণালী (dialectics) দ্বারা ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ দেখাইতে যাইয়া বলেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মই, ধর্ম্ম বিষয়ক ধারণার চরম বিকাশ বা উন্নতি। প্রাচীন গ্রীক জাতির ধর্ম্মে, মানুষের উকর্ষতা দেখানো হইয়াছে বিশেষভাবেই, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা আদৌ উচ্চ রকমের নহে। আবার, প্রাচ্য জাতিদিগের ধর্ম্মে, ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নহে। এই দুই বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় হইয়াছে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মানুষ-ঈশ্বরে (God-man-এ)। তাহাই যদি হেগেলের ধর্ম্মমত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তাঁহার দার্শনিক অদ্বৈতমতের সহিত তাঁহার ধর্ম্মমতের কোনই সামঞ্জস্য নাই। যদি ধর্ম্ম বলিতে তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মত সকল (dogmas) লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং দর্শন বলিতে তাঁহার নিজের অদ্বৈতমত লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে ধর্ম্ম এবং দর্শনের আধেয় এক, কেবল আধার ভিন্ন এই কথা ঠিক নহে।

আর এক কথা এই যে, হেগেল যে বলেন, প্রাচ্য জাতি-দিগের ধর্ম্মের মধ্যে মানুষ কিছুই নয়, ঈশ্বরই সব, এই কথাও ঠিক নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মোটের উপর ভারতীয় ধর্ম্ম সকল সর্ব্বেশ্বরবাদমূলক। যে ধর্ম্মে মানুষকে ঈশ্বরের অংশ অথবা বিকাশ মনে করে, সেই ধর্ম্মে, ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এমন কি, এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী যে সকল প্রাচ্য ধর্ম্ম, মানুষকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করে না, সেই সকল ধর্ম্মও মানুষকে ঈশ্বরের ন্যায় পারমার্থিক সত্তা বলিয়া মনে করে এবং ঈশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ তাহার কোনও পার্থক্যই স্বীকার করে না। যেটুকু পার্থক্য স্বীকার করে, তাহা জ্ঞান এবং শক্তির পরিমাণে, স্বরূপে নহে। সুতরাং হেগেল যে বলেন, প্রাচ্য জাতির ধর্ম্মে ঈশ্বরই সব, মানুষ কিছুই নহে, এই কথাও অবিসংবাদে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের আত্মা ঈশ্বরের অংশ হইলেও ইহার স্থান সৃষ্ট মানুষের উপরে, এবং ইহা ঈশ্বরের ন্যায় পারমার্থিক হইলেও ইহার স্থান সৃষ্ট মানুষের উপরে।

হেগেল বলেন, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ধর্ম্মবিকাশের উন্নততম অবস্থা এই জন্য যে, ইহাতে, ঈশ্বরের মানুষরূপে অবতীর্ণ হইবার কল্পনা আছে। যদি অবতারবাদই ধর্ম্মমতের উৎকর্ষতার মাপকাঠি হয়, তবে আমরা এই বলিতে পারি যে, হেগেল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য যে সম্মানের দাবি করেন, কোন কোনও প্রাচ্য ধর্ম্মমতও সেই দাবি করিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার এক ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মমতে, ঈশ্বর যেমন পারমার্থিক, আমাদিগের আত্মাও তেমন পারমার্থিক। সুতরাং এই ধর্ম্মমতে পারমার্থিক বিষয়ে আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতার অবকাশ রহিয়াছে। এই ধর্ম্মমতের সহিত দ্বৈতবাদের, এবং যে সকল দার্শনিক মত, ঈশ্বরের ন্যায় আমাদিগের আত্মাকেও পারমার্থিক সত্তা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের, বেশ সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্ম্মের জন্য যদি ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বে এবং করুণাময়ত্বে এবং আমাদিগের নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্য হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে দার্শনিক মতে আমাদিগের আত্মায় পারমার্থিকতা স্বীকার করা হইয়াছে কেবল তাহাতেই ইহা নির্দ্দোষভাবে, অর্থাৎ যুক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিলে, সম্ভব। ক্যাণ্টের দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা যেরূপভাবেই করা হইয়া থাকুক না কেন, তাঁহার একটি উক্তি সুস্পষ্ট, এবং ইহা এই যে, যদিও ব্যবহারিক জগতে (Phenomenal worldএ) আমরা নিয়তির অধীন, পারমার্থিক জগতে (noumenal worldএ) আমরা স্বাধীন। আত্মা পারমার্থিক সত্তা না হইলে স্বাধীন হইবে কিরূপে? তাই ক্যাণ্টের মতে, ঈশ্বর যেমন পারমার্থিক আমাদিগের আত্মাও তেমন পারমার্থিক। সৃষ্টি প্রকরণে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এইস্থলে কথাটির উল্লেখ করা গেল মাত্র। এই ধর্ম্মমতের সঙ্গে দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং দর্শন বলিতে দ্বৈতবাদ, এবং ধর্ম্ম বলিতে এই প্রকারের এক ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম

মনে করিলে, ইহা বলা যাইতে পারে যে, উভয়েরই আধেয় এক, কেবল আধার মাত্র ভিন্ন। একের আধার যুক্তি, অপরের আধার বিশ্বাস।

তৃতীয় প্রকার এক ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মমত বলে যে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় ঈশ্বর, অবস্তু হইতে (Exnihilo) জীব ও জড় উপাদান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জগৎ রচনা করিয়া ইহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, এবং যে সকল ধর্ম্ম প্রাচীন বাইবেলের পূর্ব্বভাগের প্রত্যাদেশের (Revelationএর) উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল ধর্ম্মের এই মত। অবস্তু হইতে (Exnihilo) সৃষ্টির, কোনও স্বাধীন চিন্তামূলক দার্শনিক মতেই সমর্থন নাই। কেবল তাহা নহে, এই ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত স্বাধীন চিন্তার সংঘর্ষণও হইয়াছে বড় কম নহে। এই বিশ্বাসের পরিতৃপ্তির জন্যই, দার্শনিক ব্রুনোকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া, কেপলারকে কারাবরণ করিয়া, গেলিলিওকে নিজের মত সত্য জানিয়াও তাহা যে সত্য নহে, এইরূপ স্বীকার করিয়া, এবং আমার মনে হয়, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্টকেও তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থসকল রচিত হইবার পরও দীর্ঘকাল তাহাদিগকে প্রকাশ না করিয়া।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন যুগেই হউক বা বর্ত্তমান যুগেই হউক, বিশ্বাস এবং যুক্তির সংঘর্ষণের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন সব চিন্তাশীল ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে যাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ধর্ম্মবিশ্বাসকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা

সময় আসিবেই, যখন ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই পড়িবে। ইয়ুরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মমত এবং স্বাধীন চিন্তামূলক দার্শনিক মতের মধ্যে সংঘর্ষণের সময়ও এই শ্রেণীর চিন্তাশীল অথচ ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সংকল্প ছিল, ধর্ম্মমতসকল (dogmas) যে যুক্তিসহ তাহা দেখানো। তাঁহাদিগকে বলা হইত Schoolmen বা শাস্ত্রতান্ত্রিক। তাঁহাদিগের গবেষণা-প্রণালীর নাম ছিল Scholasticism বা শাস্ত্রতান্ত্রিকতা।

সেণ্ট্ অগষ্টিন্ ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী স্কোটাস্ এবিজিনা. সেণ্ট্ এন্সেল্ম্, এবিলার্ড, সেণ্ট্ টমাস্ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার পরিপোষকতার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের সংকল্প ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম্মমত সকলকে (dogmas) যুক্তিসহ করা। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটা না চেষ্টা করিয়াছেন যুক্তির অনুসন্ধানে, ততটা করিয়াছেন প্লেটো এবং আরিষ্টটলের দার্শনিক মতের মধ্যে ধর্ম্মমতের (dogmaর) সমর্থন পাওয়া যায় কিনা, তাহার অনুসন্ধানে। প্লেটোর ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং মঙ্গলময়ত্বের মধ্যে তাঁহারা সমর্থন পাইলেন ত্রিত্বের (Trinity)—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের। তাঁহার ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সামান্য বা জাতির অস্তিত্বে এবং ইহাদিগের সজ্ঞত্ব এবং সক্রিয়ত্বের মধ্যে সমর্থন পাইলেন, ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মসঙ্ঘের (church-এর)ও যে অস্তিত্ব আছে, এবং ইহা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে পাপ

মার্জ্জনা করিতে পারে, তাহার। আরিষ্টটলের নক্ষত্রলোক এবং তথায় নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাদিগের সহিত ঈশ্বরের বাসের মধ্যে, সমর্থন পাইলেন, স্বর্গের এবং স্বর্গে যে ঈশ্বর দেবদূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, তাহার। একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ইহাতে তাঁহারা গ্রীকদর্শনকে মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে স্থান দিয়াছিলেন বাইবেলের—অন্ততঃ ইহার পূর্ব্ব ভাগের—উপরে। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন, এবিলার্ড, স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বাইবেলের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগের (Old Testament এবং New Testamentএর) মধ্যে পার্থক্য যতটা, প্লেটো এবং আরিষ্টটলের দার্শনিক মতের সহিত ইহার উত্তর ভাগের পার্থক্য ততটা নহে।

শাস্ত্রতান্ত্রিকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল, ধর্ম্মমত সকলকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু তাঁহাদিগের যুক্তি, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জন্যই এমন এক একটা সঙ্কট (moral crisis) সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাঁহার হয় বিশ্বাস না হয় যুক্তি, এই দুইটির একটিকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। শাস্ত্রতান্ত্রিকগণ ছিলেন প্রত্যাদেশ-(revelation) মূলক ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী ; সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে বিশ্বাস-পরিত্যাগ ত সম্ভবই ছিল না। তাই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল যুক্তি ; কিন্তু ইহাও স্পষ্টভাবে নহে। তাঁহারা ইহা সাধন করিলেন, যুক্তির নামে হেত্বাভাসের আশ্রয় লইয়া। ইহা ত এক প্রকার প্রতিজ্ঞাচ্যুতিই

হইল, যাহাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ বলেন প্রতিজ্ঞাহানিরূপ নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তি।

সেণ্ট্ আগষ্টিন্ শাস্ত্রতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও তিনিই ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহার বিচার-শক্তি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তিনি যদি বিশপ অগষ্টিন্ না হইতেন, তবে হয়ত খ্রীঃ [illegible] শতাব্দীর একজন সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিতেন। যখন দার্শনিক অগষ্টিনের সূক্ষ্ম যুক্তি তাঁহাকে অদ্বৈতবাদের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন বিশপ অগষ্টিন্ আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহাকে আড়াল করিয়া এবং বাধ্য করিলেন এই বলিতে যে, মানুষ কখনও ঈশ্বরের অংশ বা বিকাশ হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে তাহাকে অনেক বড় করা হয়। মানুষ কখনও এত বড় হইতে পারে না। মানুষ সৃষ্ট জীব—অবস্তু হইতে (Exnihilo) সৃষ্ট জীব। তিনি আরও বলিলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, সকল মানুষ উদ্ধার পায়। তিনি যাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহা পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আর যাহারা বাকি রহিল তাহারা উদ্ধার পাইবে না। ইহা ত যুক্তি হইল না। ইহা হইল যুক্তি ত্যাগ। কেবল তাহা নহে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরেও যে নৈষ্ঠুর্য্যের আরোপ করা হইল, আমার মনেহয়, অগষ্টিন্ তাহা ভাবিবারও অবসর পান নাই।

স্কোটাস্ এরিজিনাকে বলা হয় শাস্ত্রতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার যুক্তি তাঁহাকে এমন এক ঈশ্বরের সম্মুখীন করিল যিনি সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত এক নির্গুণ (Impersonal) সত্তা—

সদসতের উপরে, অস্তি নাস্তির উপরে, সর্ব্বতোভাবে বাক্য ও মনের অগোচর। কেবল তাহা নহে, তাঁহার যুক্তি তাঁহাকে ইহাও বলিতে বাধ্য করিল যে, স্বর্গ নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। পাপ-পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞানই পুরস্কার এবং অনুতাপই নরক। এত কথা বলিয়াও, তিনি শেষ পর্য্যন্ত, আর যুক্তি অনুসরণ করিতে পারিলেন না। শেষটায় বিশ্বাস তাঁহাকে এই বলিতে বাধ্য করিল যে, মানুষকে উদ্ধার পাইতে হইলে খ্রীষ্টের ভিতর দিয়াই পাইতে হইবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই।

সেণ্ট্ এন্‌সেল্‌ম্‌কে বলা হয় দ্বিতীয় অগষ্টিন্। তাঁহার যুক্তি বলিল যে, অবস্তু হইতে (Exnihilo) সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত নহে এবং ঈশ্বরেও কোনও গুণ আরোপ করা যায় না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস বলিল যে, মানুষের পাপ এত গুরুতর ছিল যে, ইহার জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরের নিকট সমস্যা ছিল, হয় মনুষ্যকুল ধ্বংস করা, নয় নিজে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাওয়া। ঈশ্বর নিজে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাওয়াটাই ভাল মনে করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য যীশু খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন। ঈশ্বরের যীশুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার যুক্তির মধ্যে যৌক্তিকতা কতটা আছে, পাঠক নিজেই তাহা স্থির করিবেন। এন্‌সেল্‌মের লেখা পড়িলে মনে হয়, তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসিয়া, লোক সমাজে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আর একজন শাস্ত্রতান্ত্রিক দার্শনিক এভিলার্ড। তাঁহার মতে, ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং মঙ্গলময়ত্বের প্রতীক হইয়াছে—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। তিনি আরও বলেন যে, বাইবেলের পূর্ব্বভাগ এবং উত্তর ভাগের মধ্যে যতটা পার্থক্য, গ্রীক দর্শন এবং বাইবেলের উত্তর ভাগের মধ্যে ততটা পার্থক্য নহে। তাঁহার আর এক কথা এই যে, যখন ঈশ্বরই সকল কারণের কারণ এবং আমরা তাঁহাতেই বাস করি, তাঁহাতেই চলাফেরা করি এবং তাঁহাতেই বাঁচিয়া আছি, (In as much as he is the absolute cause in whom we live, move and have our being) তখন আমাদিগের স্বাধীনতা কোথায়? আমরা যাহা করি, তাহা তিনিই করান। পাপ বলিয়াও কিছু নাই, পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। আমরা যাহা অমঙ্গল দেখি তাহা আমাদিগের ভাল হইবার শক্তি-বৃদ্ধির জন্যই। এভিলার্ডের লেখার মধ্যে ধর্ম্ম-মতের (dogmas) সমর্থন সামান্যই আছে।

সেণ্ট্ টমাসের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণ করাই হওয়া উচিত দর্শনের কার্য্য। কিন্তু যুক্তির সাহায্যে ইহা হইতে পারে না। তাই ঈশ্বর, খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার স্বরূপ এবং তিনি যে আছেন ইহা মানুষের নিকট প্রকাশ করিয়া গেলেন। অবতার বাদে বিশ্বাসী ভারতীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণও অবতার-বাদ সমর্থনের জন্য এই প্রকার যুক্তিরই অবতারণা করিয়াছেন। সেণ্ট্ টমাস্ আর একটি কথাও বলিয়াছেন যাহার সহিত ধর্ম্ম-মতের (dogmar) মিল নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বর যদিও

স্বাধীন, তথাপি তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহার মধ্যে ইচ্ছার সর্ব্বনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য (freedom of indifference) নাই। তাঁহার ইচ্ছা এবং অপরিহার্য্যতা (necessity) একার্থ বোধক।

ডন্ স্কোটাসের যুক্তি তাঁহাকে লইয়া গেল ইহার বিপরীত দিকে। তাঁহার মতে, কেবল যে ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তাহা নহে, মানুষেরও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। এই মতের সমর্থন তিনি পাইলেন আরিষ্টটলের লেখাতে।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রতান্ত্রিকগণ ধর্ম্মমতসকলকে যুক্তিসহ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

এই স্থলে পাঠককে একটি কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। যে তিনটি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মমতের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগের কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা আমরা তাহার সমালোচনা বা নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি না। সর্ব্বেশ্বরবাদও সত্য হইতে পারে, আমাদিগের আত্মা এবং ঈশ্বর এই উভয়ের পারমার্থিকতায় বিশ্বাসমূলক এক-ঈশ্বরবাদও সত্য হইতে পারে, এবং অবস্তু হইতে সৃষ্টিতে বিশ্বাসমূলক এক-ঈশ্বরবাদও সত্য হইতে পারে। আমাদিগের আলোচনার বিষয় হইয়াছে, এই তিনটির বা তাহাদিগের কোনোটির সহিত স্বাধীন চিন্তামূলক দার্শনিক মত সকলের সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা প্রদর্শন করা।

আশা করি অকাট্য যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদের সহিত সর্ব্বেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য আছে। কোনো অদ্বৈতবাদী যদি তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত মিল রাখিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসী হ'ন তবে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইতেই হইবে। দ্বৈতবাদের সহিত দ্বিতীয় প্রকার এক-ঈশ্বরবাদের অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ত্বে, সর্ব্বজ্ঞত্বে, করুণাময়ত্বে এবং আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতায় এবং নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস-মূলক ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য আছে। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বে, করুণাময়ত্বে এবং অবস্তু হইতে সৃষ্টিতে বিশ্বাসমূলক একঈশ্বরবাদের সহিত অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদ কি বহুসত্তাবাদ কোনও স্বাধীন চিন্তামূলক দর্শনের সামঞ্জস্য নাই।

জড়তান্ত্রিক দার্শনিকগণ ত আমাদিগের আত্মার নিত্যত্বেই বিশ্বাসী নহেন। সুতরাং জড়তান্ত্রিকতায় ধর্ম্মের কথাই উঠিতে পারে না, ধর্ম্মমতের সহিত ইহার সামঞ্জস্য থাকা ত দূরের কথা।

উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ ধর্ম্মের জন্য, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মার অমরত্বে এবং ইচ্ছার স্বাধীনতায়-সুতরাং নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্য। ধর্ম্মের জন্য এই প্রকার বিশ্বাস অপরিহার্য্য হইলেও, কেবল এই বিশ্বাসই ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের জন্য নৈতিক জ্ঞান এবং নৈতিক আচরণও চাই, নীতি-জ্ঞান ও তদনুসারি আচরণবর্জ্জিত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। ধর্ম্মবিশ্বাসবর্জ্জিত নৈতিক জীবন সম্ভব, কিন্তু নৈতিক জীবন ব্যতীত ধর্ম্ম সম্ভব নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ

করেন, এমন লোকের মধ্যেও এমন অনেক আছেন, যাঁহাদিগের নৈতিক জীবন পবিত্র এবং সর্ব্বপ্রকারে দোষ শূন্য। আবার এমন অনেক ধর্ম্মবিশ্বাসীও আছেন, যাঁহাদিগের নৈতিক জীবন হিংস্র পশুর জীবন হইতে কোনোও রকমেই শ্রেষ্ঠ নহে। দার্শনিক ক্যাণ্ট বলেন, নীতিই ধর্ম্মের মাপকাঠি। যে দেশে ধর্ম্ম নীতির মাপকাঠি, নীতি ধর্ম্মের মাপকাঠি নহে, সেই দেশ হইতে, ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়াছে এইরূপ মনে করিতে হইবে। অবশ্য তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নানা প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম্মের নামে পরস্পরের সহিত কলহ বিবাদ ও অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথা অল্পবিস্তর সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধেই খাটে।

ক্যাণ্ট তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধে বলেন, "বিশুদ্ধ যুক্তির (Theoritical reason) উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠীত হয় আমাদিগের জন্মগত নৈতিক জ্ঞানের উপর (Practical reason of the moral sense)। সুতরাং কোন ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মগ্রন্থের (Bible and dogmas) মূল্য, তাহারা কি পরিমাণে আমাদিগের নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করে, তাহার উপর নির্ভর করে। যে স্থলে কেবল বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এবং সাম্প্রদায়িক মত (creeds and ceremonies) নীতির স্থান অধিকার করে, সেই স্থল হইতে ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করে, এইরূপ মনে করিতে হইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম সঙ্ঘ (church) কি? নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া

যে মানব সমাজ (যত বিভিন্ন দেশের হউক না কেন) সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম সঙ্ঘ। এই প্রকার সঙ্ঘ বা স্বর্গ রাজ্যই পৃথিবীতে আনিবার জন্য যীশুখৃষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যীশুকে কেহ বুঝিতে পারে নাই। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের পরিবর্ত্তে, তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পুরোহিতদিগের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা এবং বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই পবিত্র জীবনের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ধর্ম্ম কোথায়, জনসমাজকে প্রীতি ও একতার সূত্রে বদ্ধ করিবে, তাহা না করিয়া, ইহাই তাহাকে বিভক্ত করিয়াছে শত শত সম্প্রদায়ে (sects); ফাঁকা ধর্ম্মবুলি আওড়াইয়া (by pious nonsense) সরলপ্রাণ লোকদিগকে ভুলাইয়া রাখা হয়, এবং ভগবানকেও এইভাবে চিত্রিত করা হয়, যেন তিনিও সাধারণ মানুষের মত তোষামোদ দ্বারা তুষ্ট হইয়া তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন।” তিনি আরও বলেন যে ধর্ম্মসঙ্ঘের (Christian church এর) পতনের পরাকাষ্ঠা হয় তখন, যখন স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট, ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদিগের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন। এই মত প্রকাশ করিবার অপরাধে, ক্যাণ্ট্‌কেও বিপন্ন হইতে হইয়াছিল বড় কম নয়। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে লেখা হইয়াছিল যে, যদিও তাঁহার দার্শনিক মত ধর্ম্মশাস্ত্র (dogmas) বিরুদ্ধ এবং এই মত প্রকাশ করিবার জন্য তিনি দণ্ডের যোগ্য, তথাপি গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তির

ব্যবস্থা করেন নাই, কারণ, তাঁহার দার্শনিক মত কেহ বুঝিতে পারে না, এবং ইহা দ্বারা সাধারণের বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় লিখিত এবং অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহার ফলে তাহারা বিপথগামীও হইতে পারে। যদি তিনি সাবধান না হয়েন তবে, তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। ফল হইল এই যে ক্যাণ্ট দীর্ঘকাল তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই।

যখন ধর্ম্মের এইরূপ অবনতি ঘটে, তখন তাৎকালিক দর্শনেও ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কাঁহারও কাঁহারও মনে ঈশ্বরে অস্তিত্বেই সন্দেহ উদয় হয়। ফল দাঁড়ায় জড়তান্ত্রিকতা। ধর্ম্মের নামে অবর্ণনীয়, অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াই Hume, mill প্রকৃতি দার্শনিক-দিগের জড়বাদ। হইতে পারে যে, প্রাচীন যুগের বৈদিক যাগ-যজ্ঞে পশুহত্যার প্রতিক্রিয়াই বৃহস্পতির বা চার্ব্বাক্‌দিগের জড়বাদ। চরম অচিদ্-বাদেরও প্রতিক্রিয়া হয় এবং ইহার ফল হয় চরম চিদ্‌বাদ। বর্ত্তমানের চরম জড়বাদ ও চরম চিদ্‌বাদ ইহাদিগেরর কোনোটিরই শেষ বৈজ্ঞানিক মীমাংসা নাই। অচিদ্‌বাদীরা জড়কে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় আনিয়া এক আয়তন শূন্য শক্তিতে দাঁড় করাইয়াছেন সত্য, কিন্তু শক্তি কি তাহা কেহ দেখেনও নাই জানেনও না। আমরা শক্তির ক্রিয়া কি তাহা জানি। শক্তি কি, ইহার স্বরূপ কি তাহা জানি না। তেমনি চৈতন্য কি, ইহার স্বরূপ কি, তাহাও আমরা

জানি না। আমরা ইহার কার্য্য কি তাহাই জানি মাত্র। হয়ত বা এই শক্তি এবং চৈতন্য একই সত্তার দুইটা দিকমাত্র। এমন সত্তা হয়ত বা আছে, যাহা ইহাদিগের সমন্বয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য জগদীশ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, যেমন প্রস্তর প্রভৃতি, তাহাদিগেরও সংবেদন আছে। তাহাদিগের মধ্যেও জীবনীশক্তির সাড়া পাওয়া যায়। হয়ত বা এই জীবনীশক্তিই চৈতন্য এবং শক্তির সমন্বয়—পারমার্থিক তত্ত্ব। কৌষীতকী উপনিষদে প্রাণকেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপ দ্বন্দ্বের সমন্বয় বা পরমাত্মারূপ পরম তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকদিগের মধ্যে বার্গছন্ (Bergson)ও জীবনী শক্তি (Elan vital) কেই, পারমার্থিক তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অবনতির বিষয় ক্যাণ্ট্ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অল্পবিস্তর সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অবশ্য ইয়ুরোপে ধর্ম্মের নামে যতটা অত্যাচার হইয়াছে, অন্যান্য দেশে অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ঠিক ততটা না হইলেও অল্পবিস্তর যে অত্যাচার না হইয়াছে তাহা নহে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, প্রায় সকল দেশেই, যে মূল নৈতিক ভিত্তির উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়া সহজে আচরনীয় কতক-গুলি আচারকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে, এবংমতদ্বৈধ উপস্থিত হইলেই পরস্পরের সহিত ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়

ধর্ম্মাচরণের মূল নীতি কি? সকলকে নিজের মত ভালবাসা। যীশু বলিয়াছেন, ঈশ্বরে প্রীতি এবং প্রত্যেক

মানুষকে নিজের মত ভালবাসাই ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। এই একটি নীতি পালন করিলেই সকল নীতিই পালন করা হয়—পূর্ণত্ব-লাভ ঘটে। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্ম আরও একপদ অগ্রসর হইয়া বলেন, কেবল মানুষকে কেন, সকল জীবকেই নিজের ন্যায় প্রীতির চক্ষুতে দেখিতে হইবে। মহম্মদের ও উপদেশ এই যে, মানব সমাজকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, সকল মানুষকে নিজের মত প্রীতির চক্ষুতে দেখিতে পারিলে—উপনিষদের ভাষায়, নিজের মধ্যে সকলকে, এবং সকলের মধ্যে নিজকে দেখিতে পারিলে—সকল নীতিই পালন করা হয়, মানব সমাজের মধ্যে প্রকৃত একত্ব স্থাপন করা হয়, এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যে ধর্ম্ম এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এবং যাহা ইহার বিপরীত তাহা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম।

দর্শন এবং শিল্প।

শিল্প চায় কি? অশরীরী ভাব কে শরীরী করিয়া প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য। প্রাচীনযুগের গ্রীক শিল্পীগণ ছিলেন সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাই তাহাদিগের ঈশ্বরও ছিলেন আদর্শ সুন্দর পুরুষ। তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্যেও তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন প্রস্তর খুঁদিয়া সৌন্দর্য্যের প্রকাশ করিতে। তাই, গ্রীকদিগের ঈশ্বরের প্রতীক প্রস্তর মূর্ত্তি সকল এত সুন্দর।

প্রাচ্য জাতির মধ্যে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের শিল্পীদিগের নিকট ঈশ্বর ছিলেন অনন্ত শক্তির আদর্শ। তাই তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্যে সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শক্তিরই অভিব্যক্তির প্রয়াস বেশী। শাক্ত শিল্পীর দুর্গামূর্ত্তির দশদিকে রক্ষার জন্য দশ প্রহরণ যুক্ত দশ হাত, সিংহ বাহন এবং অসুররূপী পাপের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতি দেখানোর উদ্দেশ্যই হইতেছে, ঈশ্বর যে সকল প্রকার শক্তির আধার তাহাই প্রকাশ করা। সেই ঈশ্বর যে জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যের আধার তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শক্তির দক্ষিণে এবং বামে, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের ও প্রতীক স্বরূপ সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পরিকল্পনা এবং মূর্ত্তিতে তাহার অভিব্যক্তি।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে, ধ্যান পরায়ন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখাইবার চেষ্টা হইতে, ধ্যানাবস্থায় শরীরের মাংসপেশী সকলের যেরূপ শিথিল অবস্থা থাকে তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা।

ভাস্কর যেরূপ, তাহার মনের মধ্যে যে আদর্শ মূর্ত্তিটি আছে, তাহা প্রস্তর খণ্ড খুঁদিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ চিত্র শিল্পী এবং কথা শিল্পীও তাহাদিগের মানষিক ভাবময় মূর্ত্তিকে, চিত্র এবং কথা দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। যে শিল্পের উপাদান যত সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ও তত সুস্পষ্ট। ভাস্কর একখণ্ড পাথরকে কাটিয়া মনের মধ্যে যে আদর্শটি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে চায়, কতকটা পরেও, কিন্তু উপাদান অতি স্থূল বলিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে পারে না। চক্ষু প্রভৃতিতে তেমন জীবন্ত ভাব ধারণ করাইতে পারে না। চিত্রকারের উপাদান অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তাই ভাস্কর্য্য হইতে

চিত্রশিল্পে আদর্শের অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর অভিব্যক্তি। কবির উপাদান আরও সূক্ষ্ম—কেবল কথা,—সুতরাং কবিত্বে আদর্শের অভিব্যক্তি আরও স্পষ্ট।

দার্শনিকগণও পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মনে মনে যে কল্পনা করেন যুক্তি (Reason) দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন। তাঁহাদিগের উপাদান যুক্তি (reason). ইহা কথা হইতেও সূক্ষ্ম এবং ইহার অভিব্যক্তি ও স্পষ্টতর।

এই ভাবে দেখিতে গেলে, ভাস্কর্য্যই হউক, বা চিত্রবিদ্যাই হউক, বা কবিত্বই হউক বা দর্শনই হউক, ইহাদিগের সকলকেই এক পর্য্যায়ভূক্ত করিতে পারা যায়। সকলই শিল্প।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫ (উপক্রমণিকা)	৩	পত্রিতার	পবিত্রতার
১১	১৬	পরোক্ষ	অপরোক্ষ
৩৪	১১	corelative	correlative
৩৪	১২	potarities	potarity
৪১	৯	বিজ্ঞনই	বিজ্ঞানই
৪৬	১১	উন্নিত	উন্নীত
৫৩	২৩	গৌতম	গোতম
৫৩	২৩	মাধ্ব	মধ্ব
(এবং অন্যান্য স্থলে)			
৫৪	২	উভই	উভয়ই
৬৮	১৭	যাওয়া।	যাওয়া-
৮০	১৪	বস্তুময়	বস্তুমৎ
৮২	৯	পারমার্থক	পারমার্থিক
৮২	১৬	স্বেচ্ছাই	স্বেচ্ছায়ই
৮৩	৭।৯	aperception	apperception
১০১	৮	দ্বৈতবাদীগণ	দ্বৈতবাদিগণ
১০২	৫	তাহারা	তাঁহারা
১১০	২১	পরস্পরায়	পরম্পরায়
১২৪	১৩	in comprehensible	incomprehensible
১৩৫	২২	ইশ্বর	ঈশ্বর
১৩৭	১২	বিধাও	বিধাতাও

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৬	৮	কৈবল্যা	কৈবল্য
১৬৬	২১	মৈতিক	নৈতিক
১৭৪	৯	নির্ম্মল	নির্ম্মূল
১৭৭—১৯২		পঞ্চম প্রকরণ	ষষ্ঠ প্রকরণ।
১৭৭	২০-২২	বেন্থাম	বেন্থাম
১৯০	৬	নিরামক	নিয়ামক
১৯১	৬	অতৈবাদ	অদ্বৈতবাদ
২০৫	১৫	প্রতিষ্ঠীত	প্রতিষ্ঠিত
২০৭	১২	জড় তান্দ্রিকত্মা	জড় তান্ত্রিকতা
	১৩	mill	Mill
২০৮	৮	কৌধীতকী	কৌষীতকি
৩৩	২১	তুলনাই	তুলনায়ই
৩৪	১২	দ্বন্ধের	দ্বন্দ্বের
৫৫	৭	শঙ্কর)	শঙ্কর)।
১৫১	২০	ভাষাষ	ভাষায়
১৫৬	১৫	তাঁলাকে	তাঁহাকে
১৫৭	১৮	চিন্তা	চিন্তা
১৫৯	১২	সেইরূপমন আমাদিগেয়	সেইরূপ আমাদিগের
১৮০	১৩	হইয়াই	হওয়াই
২০৪	১৬	ইশ্বরের	ঈশ্বরের
২০৫	১৫	প্রতিষ্ঠীত	প্রতিষ্ঠিত
২০৫	১৬	of	or
২০৭	১১	ঈশ্বরে	ঈশ্বরের